KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : 22/১ 22/2 22/৩	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৭ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫৭ কার্তিক - পৌষ ১৩৫৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLML...

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

আলো ও পাখার কথা মনে রাখবেন

আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না
কিন্তু হাজার হাজার রেলযাত্রী নেমে
যাবার সময় কামরার আলো ও পাখার
সুইচ বন্ধ করেন না ;
ফলে ব্যাটারী অকেজো হওয়া ও বদলাইয়ের
জন্য রেলের সমূহ ক্ষতি হয়।

এই কারণে পরে যাঁরা ভ্রমণ করতে আসেন
তাঁদের এই সব সুযোগ সুবিধা
থেকে বঞ্চিত হয়েই ভ্রমণ করতে হয়।

সুইচের কথা ভুলবেন না

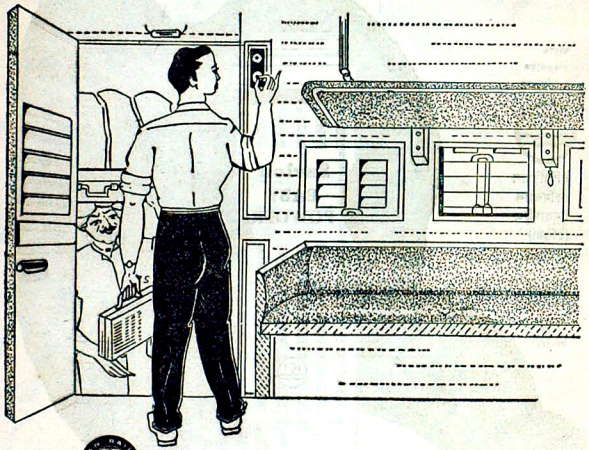

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

IPB/55-2

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

কাজী আব্দুল ওদুদ ॥ রবীন্দ্রনাথ ১

মণীন্দ্র রায় ॥ যদি একবার ১৫

বিষ্ণু দে ॥ সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে ১৬

অশোকবিজয় রাহা ॥ চৈত্রসন্ধ্যা ১৮

মনীশ ঘটক ॥ কনখল ১৯

অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ ৩৪

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ বৃষ্টির পরে ৬৬

আর্ণল্ড টোয়েনবি ॥ বিশ্বজনীন ঐক্য ৭৩

হরপ্রসাদ মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ৮৬

সমালোচনা—প্রমথনাথ বিশী, চিদানন্দ দাশগুপ্ত,
নৃপেন্দ্র সান্যাল, সুশীলকুমার গুপ্ত ৯৪

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

চতুরঙ্গ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৭

রবীন্দ্রনাথ

কাজী আব্দুল ওদুদ

মনীষা ভিন্ন আরো নানা ধরনের সম্পদ রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলোয় রয়েছে, যেমন, প্রকৃতি-প্রেম, ভগবৎ-প্রেম, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম, মহতের পূজা, কৌতুকহাস্য, শ্লেষ ইত্যাদি। এসবের কিছু কিছু পরিচয় এই সংগ্রহেও পাওয়া যাবে। তবু ধর্ম রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষার মতো গুরু বিষয়ের প্রবন্ধে মনীষাই যে সব চাইতে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ সে-সম্বন্ধে দ্বিমত না হবারই কথা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে আমাদের বক্তব্য হয়ত আর একটু পরিষ্কার হবে। ধর্মজীবনে ভক্তি খুব বড় ব্যাপার; কারো কারো মতে ভক্তি-তন্ময়তাই ধর্মজীবনের সব চাইতে বড় লক্ষণ। ভক্তি ও ভক্তি-সাধন সম্পর্কে অনেক রচনা কবির "ধর্ম", "শান্তিনিকেতন", এসব গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু সেসব থেকে আমরা খুব কম অংশই গ্রহণ করতে পেরেছি। সেই বিভাগ থেকে 'ভাবুকতা ও পবিত্রতা'র মতো লেখা অবশ্য আমরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছি, তার কারণ, তাতে কবি যেমন সচেতন ভক্তির অসাধারণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তেমনি তার আনুষঙ্গিক দুর্বলতা সম্বন্ধেও। গদ্য বিচারের ভাষা। অন্যান্য সম্পদে ভূষিত হতে গদ্যের আপত্তি নেই, বরং আগ্রহ আছে; কিন্তু বিচার গদ্যের প্রাণ। সেই গদ্যই মূল্যবান তীক্ষ্ণ বিচারবোধ যার ন্যায়ু ও মজ্জা-স্বরূপ। তাছাড়া সাহিত্যের লক্ষ্য কোনো বিশেষ পাঠক-গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য সাধারণ মানব-সমাজ—কিছু কৌতূহল, কিছু কাণ্ডজ্ঞান আর কিছু শুভবুদ্ধি যাদের নিত্যসম্পদ জ্ঞান করা হয়। মানুষের কোনো একঝোঁকা পরিণতি নয়, তার সমগ্র চেতনাকে ঔদাসীন্য ও অবসাদ থেকে জাগিয়ে তোলা সাহিত্যের চিরদিনের বড় কাজ।

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মনীষার মূলে তাঁর ধর্মবোধ, অন্ততঃ, ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর মনীষা অতি নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের প্রথমেই চাইতে হয় তাঁর ধর্মবোধের পানে। তাঁর পিতার ধর্মবোধ ও ধর্ম-সাধনা তাঁর উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা আমরা জানি ও মানি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটি ব্যাপারও তুল্যস্বীকৃতির দাবি রাখে, সেটি হচ্ছে—বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অপূর্ব সচেতনতা। কবি তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে তাঁর বালককালের যে ছবি এঁকেছেন তাতে দেখা যায় প্রতিদিনের সূর্যোদয় বালক-বয়সে তাঁর জন্য কী অসীম-রহস্য-ভরা ছিল; আর শান্তিনিকেতনের বর্ষীয়ান আশ্রমিকদের

মুখে শোনা যায় সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে উঠে তাঁরা দেখতেন কবি নীরবে পূবের দিকে মুখ করে বসে আছেন সূর্যোদয়ের প্রতীক্ষায়। তাঁর প্রায় বিশ বৎসর বয়সে এই সূর্যোদয় একদিন তাঁর সমস্ত চেতনায় কী অমৃতময় অনুভূতির সঞ্চার করেছিল তার পরিচয় রয়েছে এই সংগ্রহের 'মানব-সত্য' প্রবন্ধে। ঋতুপর্যায় মেঘবৃষ্টি বহতা নদী এসব সারাজীবন তাঁর অন্তরে অন্তহীন সুর জাগিয়েছে। আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি যা কিছু প্রতিভাত হচ্ছে সব অমৃত আনন্দরূপ, উপনিষদের এই বাণী তাঁর কণ্ঠে বার বার ধ্বনিত হয়েছে; কিন্তু তাঁর জীবনের দিকে চাইলে বোঝা যায় বিশ্বপ্রকৃতির এই অমৃতময় আনন্দরূপের উপলব্ধি শুধু যে উপনিষদ থেকে তাঁর লাভ হয়েছিল তা নয়—এই চেতনা ছিল তাঁর সহজাত মহাসম্পদ।

এর সঙ্গে আরো স্মরণ করবার আছে তাঁর পরিবেশের প্রভাব—সেই পরিবেশ বলতে বুঝতে হবে যে বিশেষ পরিবারে ও সমাজে আর যে বিশেষ দেশে ও কালে তিনি জন্মেছিলেন সেই সবই। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম-ধর্ম ও সমাজের দ্বিতীয় প্রবর্তক। উপনিষদের চিন্তা তাঁর জীবনে গভীরভাবে সক্রিয় হয়েছিল সত্য, কিন্তু সেই উপনিষদের সব কিছু তিনি গ্রহণ করেননি। আর উপনিষদের ব্রহ্মের ধারণার সঙ্গে তাঁর জীবনে তুল্যভাবে সক্রিয় হয়েছিল তাঁর কালের নবমানবিকতার লোকহিত-সাধনমন্ত্র। এই দুইই হয়েছিল রবীন্দ্রনাথেরও গভীর আত্মিক সম্পদ। এই লোকহিত-সাধনের বিশেষ অর্থ অবশ্য দাঁড়িয়েছিল স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন। শুধু মহর্ষির ভিতরে নয় তাঁর পরিজনদের মধ্যেও এই স্বদেশ ও স্বজাতিচেতনা প্রবল ছিল। কিন্তু অচিরে এই চেতনা প্রবলতর রূপ নিয়ে দেখা দেয় বহত্তর বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে। সেই প্রবলতর স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনায় রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ দেখা যায় শুধু তাঁর যৌবনে নয় তাঁর পরিণত যৌবনে আধ্যাত্মিকচেতনা যখন তাঁর ভিতরে প্রবল হ'ল সেই কালেও। এমন কি তাঁর আধ্যাত্মিকচেতনা যেন বিশেষ মহিমা সঞ্চার করে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনায়—তার পরিচয় রয়েছে ভারতের বৌদ্ধযুগের ও মধ্যযুগের রাজপুত-শিখ-মারাঠার ত্যাগপূত জীবনসম্বন্ধে তাঁর অতুলনীয় গাথাগুলোয়। প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের মহিমা এই কালে তাঁর বহু রচনায় কীর্তিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আফ্রিকার বেয়ার-যুদ্ধে শক্তি ও সভ্যতা-দর্পী ইয়োরোপ যে অবিশ্বাস্য বর্বরতার পরিচয় দেয় তাতে ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি অনেকখানি সন্দিহান হন, আর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থল জ্ঞান করেন প্রাচীন ভারতের সরল নির্লোভ ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবনকেই। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ঘটে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। কবি সেই আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগ দেন, কিন্তু তাঁর নব-আদর্শ-নিষ্ঠার ফলে ইংরেজ-বিদ্বেষের কোনো কথাই তাঁর মুখে উচ্চারিত হয় না, এক অসাধারণ প্রত্যয়ের সঙ্গে তিনি দেশের লোকদের বলেন ধর্মবর্ণনির্বিশেষে দেশের সবাইকে আপন জেনে ভালবাসতে, আর শাসকদের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সব করণীয় নিজেরা করতে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে কবির লেখায় ও কাজে ভগবৎ-প্রেমের ও স্বদেশ-প্রেমের এক অপূর্ব সমন্বয় প্রকাশ পায়।

প্রধানত শাসকদের পীড়নের ফলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন বোমা-বিভ্রাটের রূপ নেয়। যে অসহায়তা-বোধ থেকে তরুণ দেশ-প্রেমিকদের একটি দল সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিত হয় কবি তার পরিমাণ সহজেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এক অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন ভারতবর্ষের মতো দেশের বিচিত্র জটিল সমস্যা, ভারতের মহান

ঐতিহ্যের অশেষ অর্থপূর্ণতা আর ভারতবর্ষের মতো দেশে সন্ত্রাসবাদের সমূহ অকার্য-কারিতা। তাঁর সেই উপলব্ধি দ্বিধাহীন কণ্ঠে সেই কালে তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে।

এর পর থেকে তাঁর ঐকান্তিক প্রচারের বিষয় হয়—উগ্র জাতীয়তা পরিহার আর জ্ঞান শান্তি ও মৈত্রীর পথ অবলম্বন। শুধু ভারতে নয় বহত্তর জগতেও এই বাণী তিনি দীর্ঘকাল প্রচার করেন। তাঁর দুটি সুপরিচিত গানে তাঁর পরিণত জীবনের এই চিন্তা পরম-হৃদয়গ্রাহী রূপ পেয়েছে, সেই দুটি গানের প্রথমটির প্রথম পদ হচ্ছে—

হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে জাগোরে ধীরে,

আর দ্বিতীয়টির প্রথম পদ হচ্ছে—

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব।

সেই দিনে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি কবির এই চিন্তাকে জ্ঞান করেছিলেন এক শ্রেণীর আদর্শবাদ, অর্থাৎ শুনতে ও ভাবতে ভাল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে স্বল্পমূল্য। কিন্তু দুই মহাযুদ্ধের পরে আর সাম্প্রতিক কালে আণবিক অস্ত্রের সর্বধ্বংসী ক্ষমতার প্রমাণ পেয়ে অনেকেই বুঝতে পারছেন টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধীর মতো যুদ্ধবিরোধী আর শান্তি ও মৈত্রীকামী একালের মহাপুরুষেরা কত বড় সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন মানব-বন্ধু। একালে সভ্যতার এক দারুণ সংকটে তাঁরা নির্দেশ দিয়ে গেছেন মানুষের বাঁচার পথের। অবশ্য মানুষ বাঁচার পথে চলবে, না, মরার পথেই পা বাড়াবে, কে আর তা বলতে পারে।

বলা যেতে পারে কবির তেত্রিশ বৎসর বয়সে লেখা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনা প্রথম স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় এতকাল যে শুধু কাব্যচর্চায় তাঁর দিন কেটেছে তাতে তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছেন আর বলছেন, এবার তাঁর কাজ হবে 'মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা' দেওয়া, 'শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে আশা' সঞ্চারিত করা। যে আদর্শের নতুন প্রেরণা তাঁর লাভ হয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি বলছেন—

বল মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুখ; স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

তিনি আরো উপলব্ধি করছেন, বৃহৎ জগতের কাজে আত্মসমর্পণ করে আর সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা জেনে নির্ভয়ে তার দিকে অগ্রসর হতে হবে—

জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।

কিন্তু কে সে? তার উত্তরে কবি বলেন—

জানি না কে। চিনি নাই তারে—
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগে হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সংগীতের মতো।

এখানে দেখা যাচ্ছে কবির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক চেতনার বা ভগবৎ-চেতনার সঞ্চার হয়েছে তার কাজ হচ্ছে মহত্তর জীবনের অভিমুখে এক প্রবল প্রেরণাদান।—এমন প্রেরণার পথে চলে কবির কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হয় তার পরিচয় রয়েছে তাঁর নানা কবিতায় নাটকে গানে ও গদ্যরচনায়। শেষে তাঁর এই ধর্মবোধের কিছু ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেষ্টা করেন অক্স্‌ফোর্ডে তাঁর হিবার্ট-বক্তৃতা-মালায় ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতামালায়। "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। সেই বক্তৃতামালার ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> স্বার্থ আমাদের যে সব প্রয়াসের দিকে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীব-প্রকৃতিতে; যা আমাদের ত্যাগের দিকে তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।
>
> কোন্‌ মানুষের ধর্ম। এতে কার পাই পরিচয়। এ তো সাধারণ মানুষের ধর্ম নয়, তাহলে এর জন্য সাধনা করতে হয় না।
>
> আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজেই তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন।

দেখা যাচ্ছে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় এক মহত্তর জীবন-চেতনার কথা তিনি যে ব্যক্ত করেছিলেন ধর্মজীবন বলতে সেই মহত্তর জীবন-চেতনাই তিনি উত্তরকালেও বুঝেছেন। সেই মহত্তর জীবন-চেতনা নিয়ত-বিকাশশীল, নব নব সার্থকতার পথে ধাবমান—কবির ভাষায়—

> আলোকেরই মতো মানুষের চৈতন্য মহাবিকিরণের দিকে চলেছে জ্ঞানে কর্মে ভাবে।

প্রচলিত কথায় যাকে ধর্ম বলা হয় তা অবশ্য অনুষ্ঠানসর্বস্ব—মহত্তর জীবন-চেতনার কোনো লক্ষণই সাধারণত তাতে দেখা যায় না; কিন্তু বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে এমন সব বাণী আছে যা থেকে বোঝা যায় সেসবে ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকের কথাই ভাবা হয়নি, মহত্তর জীবন-চেতনা বলতে যা বোঝায় তার কথাও ভাবা হয়েছিল।

আর একালে, অর্থাৎ ফরাসী বিপ্লবের পরে থেকে, ধর্ম বলতে প্রধানত মানুষের মহত্তর জীবন-চেতনার মতো ব্যাপারই বোঝা হচ্ছে। গ্যেটে তাঁর ভিল্‌হেলম্‌ মাইস্‌টার-এর শেষের দিকে ধর্ম সম্পর্কে এই মর্মের উক্তি করেছেন : নিজেকে শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, অবশ্য এই শ্রদ্ধা অহমিকা ও দুরাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। ভারতের নব জীবনারম্ভের মহান পথপ্রদর্শক রামমোহনের একটি অতি প্রিয় বাণী ছিল এই : The true way of serving God is to do good to man. একালের কোনো কোনো খ্যাতনামা চিন্তাশীল অবশ্য ধর্মের উপরে জোর দেননি; তাঁরা ধর্মকে বরং অবিশ্বাস করেছেন, আর জোর দিয়েছেন বিজ্ঞানচর্চা ও অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধির উপরে। কিন্তু সমসাময়িক কালের অনেক পাশ্চাত্ত্য মনীষী ধর্মবোধের উপরে নতুন করে জোর দিচ্ছেন, আর সে-ধর্মবোধ মূলত

মহত্তর জীবন-চেতনা। এঁদের নেতৃস্থানীয় Albert Schweitzer-এর একটি উক্তি এই—

> That we have lapsed into pessimism is betrayed by the fact that the demand for the spiritual advance of society and mankind is no longer seriously made among us...........
>
> Salvation is not to be found in active measures, but in new ways of thinking.
>
> But new ways of thinking can rise only if a true and valuable conception of life casts its spell upon individuals.
>
> The one serviceable world-view is the optimistic-ethical.
>
> *Civilisation and Ethics.*

আমাদের দেশের অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার তুলনা করলে সহজেই চোখে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের ধর্ম অনুভূতি-মূলক, কোনো তত্ত্বচিন্তা থেকে মুখ্যত তার উৎপত্তি নয়, কোনো তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে তা নিবিড়ভাবে যুক্তও নয়। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি কবিতা এই—

এ কথা মানিব আমি এক হতে দুই,
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।
কেমনে যে কিছু হয়, কেহ হয় কেহ
কিছু থাকে কোনো রূপে, কারে বলে দেহ,
কারে বলে আত্মা মন, বুঝিতে না পেরে
চিরকাল নিরখিব বিশ্ব জগতেরে
নিস্তব্ধ নির্বাক চিত্তে। বাহিরে যাহার
কিছুতে নারিব যেতে আদি অন্ত তার
অর্থ তার তত্ত্ব তার বুঝিব কেমনে
নিমেষের তরে। এই শুধু জানি মনে
সুন্দর সে, মহান সে, মহাভয়ংকর,
বিচিত্র সে, অজ্ঞেয় সে, মম মনোহর।
ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।

তাঁর 'মানবসত্য' প্রবন্ধেও কবি এক জায়গায় বলেছেন—

> সেদিন অক্স্‌ফোর্ডে যা বলেছি তা চিন্তা করে বলা। অনুভূতি থেকে উদ্ধার করে অন্য তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে যুক্তির উপরে খাড়া করে বলা।

অদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অথবা অন্যান্য প্রাচীন ধর্মচিন্তায় মূল ব্যাপার হচ্ছে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, অর্থাৎ যা জগতরূপে প্রতিভাত হচ্ছে তার অতিরিক্ত কিছু, তা নাম তার যা-ই দেওয়া হোক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর যতটা সত্য মানব-জীবন তার চাইতে কম সত্য নয়। এর সমর্থনে তাঁর বহু উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে; তাঁর 'ধর্মের অধিকারে'র একটি উক্তি এই—

> ব্রহ্মই পরিপূর্ণ সত্য এবং তাঁহাকেই পূর্ণভাবে পাইতে হইবে এই কথাটিকে

খাটো করিয়া বলা তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) কর্ম নহে—তাই তাঁহারা স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, তাঁহাকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল জপতপ করিয়াই কাটায় অন্তবদেবাস্য তদ্ ভবতি, তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়—তাঁহাকে না জানিয়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয়, সকৃপণঃ—

—সে কৃপাপাত্র।

...বিচারই মানুষের ধর্ম। উচ্চ ও নীচ, শ্রেয় ও প্রেম, ধর্ম ও স্বভাবের মধ্যে তাহাকে যাছাই করিয়া লইতেই হইবে।...মানুষ নিয়ত আপনার সর্বশ্রেষ্ঠকেই প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার সাধনার লক্ষ্য।.....

যে আপনার সর্বোচ্চকেই সর্বোচ্চ সম্মান না দেয় সে কখনই উচ্চাসন পাইবে না।

আর শেষের দিকে মানব-জীবনের মহত্তর পরিণতিই তাঁর মনোযোগ যেন বেশী আকৃষ্ট করেছে, যেমন, 'মানুষের ধর্মে' তিনি বলেছেন—

মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্য-বোধ অবলম্বন করে আপন দেবতায় এসে পৌঁচেছে।.....

জাগতিক ভূমা আমাদের জ্ঞানের পরিপূর্ণতার বিষয় মানবিক ভূমা আমাদের সমগ্র দেহ মন ও চরিত্রের পরিতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতার বিষয়.....

পরমাত্মা মানবপরমাত্মা ইঁনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ইঁনি আছেন সর্বদা জনে-জনের হৃদয়ে।

—এর থেকে অনেকখানি নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে রবীন্দ্রনাথ একালের মানুষ, তাঁর ধর্মবোধ একালেরই ধর্মবোধ তা প্রাচীন শব্দ ও রূপ-কল্পনা যতই তিনি ব্যবহার করে থাকুন।— বাউলদের প্রতি বহু জায়গায় তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। বাউলদের সঙ্গে তাঁর দুইক্ষেত্রে বড় মিল রয়েছে—বাউলদের মতো তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত, আর বাউলদের মতনই তিনি অসীম ও অরূপের প্রেমিক। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর খুব বড় অমিল এই ক্ষেত্রে যে বাউলরা বৈরাগী ও মরমী, কিন্তু তিনি জীবনবাদী ও সভ্যতার ক্রমোৎকর্ষে আস্থাবান। হয়ত এই গূঢ় কারণেই তিনি প্রাচীন ধর্মপন্থী, ভক্তি-মার্গী, বাউল, কারো মতনই গুরুবাদী নন। এ সম্বন্ধে তাঁর এই বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধারিত হয়েছে তাঁর এক নায়কের মুখে—

আমার অন্তর্যামী কেবল আমার পথ দিয়াই আনাগোনা করেন—গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচয় আমাদের হয়েছে। এ স্বাভাবিক কেননা জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা আসলে অবিভাজ্য। তবু নানা ভাগে ভাগ করেই আমরা জীবন ও জীবনের প্রচেষ্টা বুঝতে চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা সম্বন্ধে এইবার একটু খোঁজ নেওয়া যাক। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের যোগ অঙ্গাঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার সঙ্গেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করবো সমাজ সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা।

প্রথম যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ কয়েকখানি প্রবন্ধ-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সেইগুলি এখন প্রচলিত নেই—"অচলিত সংগ্রহে" স্থান পেয়েছে। সেই সব প্রবন্ধের মধ্যেও উপভোগ্য রচনা কিছু কিছু আছে; দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে শ্লেষোক্তিও দুই একটিতে

চোখে পড়ে। তবে মোটের উপরে সেই সব লেখার জগৎ সংকীর্ণ জগৎ—কবি যেন নিজের সঙ্গে, অথবা একটি সুপরিচিত বন্ধু মহলে, আলাপ করছেন, বহুত্তর দেশ বা জগৎ যেন তাঁর চিন্তার বিষয় নয়। ব্যাপক মানব-সমাজের সঙ্গে লেখকের যোগের অভাব ঘটলে তাঁর রচনার আবেদনে ত্রুটি ঘটা স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথকে প্রতিভাদীপ্ত প্রাবন্ধিকরূপে প্রথম দেখা যায় 'সাধনা' পত্রিকায়, তাঁর প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে। এর পূর্বেও দু-একটি প্রবন্ধ (যেমন তাঁর ২৭ বৎসর বয়সে লেখা 'হিন্দু বিবাহ'-এ) তাঁর শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু শক্তির প্রকাশ সেখানে আশানুরূপভাবে সুন্দর নয়। 'সাধনা'র যুগে দেখা যায় একই সঙ্গে তিনি দক্ষহস্তে কলম চালিয়েছেন সমাজ রাষ্ট্র ও শিক্ষা বিষয়ে—সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে তো বটেই।

কবির ধর্মবোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি তাঁর নবযৌবনে তাঁর পরিবেশে স্বদেশ ও স্বজাতি-চেতনা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রবল বললে সব কথাটা বলা হয় না—একটি উল্লেখযোগ্য দলের ভিতরে এই চেতনা হয়েছিল উৎকট। তাদের আর্যামির দম্ভ ও আরো নানা উদ্‌ভট চিন্তার প্রতি কবি বহুবার বহু শাণিত বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। এই সংগ্রহেও তার পরিচয় পাওয়া যাবে। নিজে প্রবলভাবে স্বদেশ ও স্বজাতির অনুরাগী হয়েও এমন আঘাত হানা কবি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেছিলেন, কেন না, তিনি চাচ্ছিলেন দেশের সত্যকার শ্রীবৃদ্ধি যা সম্ভবপর স্বভাব ও জ্ঞানের পথে, অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক পন্থায় কখনো নয়। বহুকালের নানা আচার ও সংস্কারের ভারে ব্যাহত হয়েছিল আমাদের দেশের জীবন ও চিন্তার গতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নানা কারণে বর্ধিত জাতীয় অহমিকা সেই ব্যাহত গতিতে আরো বিচিত্র বিঘ্ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সব অদ্ভুতত্বের সঙ্গে সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় স্বাক্ষর রেখে গেছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বভাব ও কাণ্ডজ্ঞান যে নতুন মহিমা লাভ করলো এজন্য সে-সাহিত্য আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ হয়েছে।

কবি তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নিজে বলেছেন—

আমাদের বাহ্য-পরিবার আধুনিক হিন্দুসমাজের বাহ্য আচার-বিচার ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ব বশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।...সেই উৎসাহ আমার মনকে একটি বিশেষ-ভাবে দীক্ষিত করেছে।—সেই ভাবটি এই যে, জীবনের যা কিছু মহত্তম দান তার পূর্ণ প্রকাশ আমাদের অন্তরপ্রকৃতির মধ্য থেকেই। আমাদের স্বভাব-সীমার বাইরে শ্রেষ্ঠ জিনিসের অভাব নেই, লোভনীয় পদার্থ অনেক আছে, সে-সমস্তকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনে যদি না আমাদের প্রকৃতির মধ্যে তাদের আত্মসাৎ করি।

এই চিন্তার দ্বারা চালিত হয়ে ইংরেজি ভাষার সেই সর্বব্যাপী প্রভাবের দিনে তিনি বার বার চেষ্টা করেন প্রাদেশিক রাষ্ট্রসভায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাংলার চর্চা প্রবর্তন করতে। ইংরেজের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের লোক শিক্ষাদান, দেশের জলকষ্ট নিবারণ, এ সব গঠনমূলক কাজের ভার নিজেরা নিক, এ প্রস্তাবও বার বার তিনি সর্বসাধারণের সামনে উপস্থাপিত করেন।

ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের ভিতর দিয়ে ভারত-ভাগ্য-বিধাতার কোনো বিশেষ

অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে কিনা কবি এই প্রশ্নেরও সম্মুখীন হন। এ সম্বন্ধে তাঁর খুব উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'।

ভারতবর্ষের নিজস্বতা সম্বন্ধে চেতনা আরো বহুভাবে কবিকে চিন্তা ও কর্ম-তৎপর করে। ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদ তার ভারতশাসনকে করেছিল বহুল পরিমাণে যন্ত্রধর্মী। তাতে ইংরেজের প্রতাপ ও দম্ভ প্রকাশ পাচ্ছিল খুব, আর সেই অনুপাতে অভাব ঘটেছিল ভারতের প্রতি তার মমত্ববোধের। কবির আত্মসম্মান-বোধ এতে গভীরভাবে পীড়িত হয়েছিল আর ইংরেজের এই ঔদ্ধত্যের প্রতি আঘাত হানতে তিনি কখনো পশ্চাৎপদ হননি। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতা সম্পর্কে তাঁর প্রতিবাদ সুবিদিত, তার বহু পূর্বে লর্ড কার্জনের ঔদ্ধত্যের প্রতিও তাঁর অকুণ্ঠিত প্রতিবাদ স্মরণীয় হয়ে আছে।—কিন্তু এই সব প্রতিবাদে কবির অপূর্ব একটি বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রতি ব্যবহারে ইংরেজ তার সাম্রাজ্যিক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত; সেজন্য নিষ্ঠুর তার লোভ, বীভৎস তার আচরণ। কিন্তু ইংরেজকে এমন বর্ণে চিত্রিত করেও তার প্রতি শ্রদ্ধা তিনি হারাননি, কেন না একটি বড় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সে বাহন, একালে-অশেষ-অর্থপূর্ণ বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতাও সে ভারতবর্ষে বহন করে এনেছে। বিপক্ষ সম্বন্ধে এমন মনোভাবকে অসাধারণ বলতেই হবে। কিন্তু একটু ভাবলেই বুঝতে পারা যায় এই হওয়া উচিত সভ্য ও আলোকপিয়াসী মানুষের মনোভাব, কেন না, বিপক্ষের প্রতি ঘৃণা ও অন্ধতা শুধু বিপক্ষকেই আঘাত করে না, সেই ঘৃণা ও অন্ধতাপোষণকারীকেও গভীরভাবে আহত করে। অবশ্য এ পথ কঠিন। কিন্তু মানুষের সত্যকার কল্যাণের পথ কোনোদিনই সহজ নয়। কবির শেষ বড় লেখা "সভ্যতার সংকটে" দেখা যায় ইংরেজের—অথবা ইয়োরোপীয় সভ্যতার—প্রতি তাঁর এই শ্রদ্ধা নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। তবু তিনি সেই লেখাটিতেই বলেছেন—

> ...মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

জাতীয়তা কী? সব দেশে জাতি গঠন কি একই পদ্ধতিতে হয়েছে? তাদের লক্ষ্য কি একই? এই সব প্রশ্ন এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে প্রবল হয়েছিল। বলাবাহুল্য ভারতবর্ষের নিজস্বতার সন্ধানই ছিল তার মূলে। কবি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় সমাজ আর ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূল আশ্রয় রাষ্ট্রনীতি। তাঁর মতে—

> সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য তবে আমরা ভুল করিব।

কবির এই ধরনের কথা থেকে ধারণা হতে পারে ভারতবর্ষের পথ আর য়ুরোপের পথ স্বতন্ত্র এই কবির বক্তব্য। এক সময়ে এমন একটা ধারণার দিকে তিনি যে ঝুঁকেছিলেন তা বলা যায়। কিন্তু তাঁর ১৯১৭ সালের বিখ্যাত 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' লেখাটিতে দেখা যায় তিনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে যা শ্রেষ্ঠ, মানুষের জীবনে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা এনে দিতে পারে, তা সব মানুষের জন্য কাম্য, তা পাবার জন্য সবাইকে যত্নবান হতে হবে, যারা তা দিতে পারে তাদের তা দিতেও সচেষ্ট হতে হবে। কবির উক্তি এই—

> যে জাতি কোনো বড় সম্পদ পাইয়াছে সে তাহা দেশে দেশে দিকে দিকে দান করিবার জন্যই পাইয়াছে।...য়ুরোপের প্রধান সম্পদ বিজ্ঞান এবং জনসাধারণের ঐক্যবোধ ও আত্মকর্তৃত্ব লাভ। এই সম্পদ এই শক্তি ভারতকে দিবার

> মহৎ দায়িত্বই ভারতে ইংরেজ-শাসনের বিধিদত্ত রাজপরোয়ানা।...আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে, সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এক কোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়। যে-দিকের সলতে দিয়াই হ'ক আলো জ্বালাই চাই।...ভারতের জরাবিহীন জাগ্রত ভগবান আজ আমাদের আত্মাকে আহ্বান করিতেছেন, যে-আত্মা অপরিমেয়, যে-আত্মা অপরাজিত, অমৃতলোকে যাহার অনন্ত অধিকার, অথচ যে-আত্মা আজ অন্ধ প্রথা ও প্রভুত্বের অপমানে ধুলায় মুখ লুকাইয়া...যুগে যুগে আমাদের পুঞ্জ পুঞ্জ অপরাধ জমিয়া উঠিল, তাহার ভারে আমাদের পৌরুষ দলিত, আমাদের বিচারবুদ্ধি মুমূর্ষু,—সেই বহু শতাব্দীর আবর্জনা আজ সবলে সতেজে তিরস্কৃত করিবার দিন। সম্মুখে চলিবার প্রবলতম বাধা আমাদের পশ্চাতে; আমাদের অতীত তাহার সম্মোহনবাণ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎকে আক্রমণ করিয়াছে; তাহার ধূলিপুঞ্জে শুষ্ক পত্রে সে আজিকার নূতন যুগের প্রভাতসূর্যকে ম্লান করিল, নব নব অধ্যবসায়শীল আমাদের যৌবন-ধর্মকে অভিভূত করিয়া দিল, আজ নির্মম বলে আমাদের সেই পিঠের দিকটাকে মুক্তি দিতে হইবে তবেই নিত্যসম্মুখগামী মহৎ মনুষ্যত্বের সহিত যোগ দিয়া আমরা অসীম ব্যর্থতার লজ্জা হইতে বাঁচিব, সেই মনুষ্যত্ব যে মৃত্যুঞ্জয়ী, যে চিরজাগরূক, চিরসন্ধানরত, যে বিশ্বকর্মার দক্ষিণ হস্ত, জ্ঞানজ্যোতিরালোকিত সত্যের পথে যে চিরযাত্রী, যুগে যুগে নব নব তোরণ দ্বারে যাহার জয়ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া দেশদেশান্তরে প্রতিধ্বনিত।

স্মরণ করবার আছে কবি 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'-এর বহু পূর্বে লেখা তাঁর 'ততঃ কিম্' প্রবন্ধে বলেছিলেন, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মনিষ্ঠ গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শ এমন একটি অর্থপূর্ণ আদর্শ যা শুধু হিন্দুর জন্য ভাল নয় সব মানুষের জন্যই ভাল।

কবি তাঁর কালের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা নিয়েও কম চিন্তা করেননি। এই বিরোধে তিনি খুব দুঃখ পান। মূল সমস্যাটি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য দাঁড়ায় এই: সামাজিক ব্যবহারে হিন্দুর অনুদারতা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে যেমন একটি বড় বাধা তেমনি বড় বাধা ধর্মচিন্তা সম্পর্কে মুসলমানের অনড় মনোভাব (কবির ভাষায় 'এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের' সংঘর্ষ)। এই দিক দিয়ে দেখলে বোঝা যায় সমস্যাটি কত কঠিন। কিন্তু এর সমাধান কোথায়? কবির উত্তর—

> মনের পরিবর্তনে, যুগের পরিবর্তনে। য়ুরোপ সত্যসাধনা ও জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্য যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌঁচেছে হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমনি গণ্ডির বাইরে যাত্রা করতে হবে।...হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগপরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে।

আমাদের দেশে শুধু হিন্দু আর মুসলমানই নেই আছে বিচিত্র-মতাবলম্বী বিচিত্র-আচার-পন্থী নানা প্রদেশে ও অঞ্চলে বিভক্ত নানা ভাষাভাষী প্রায় সংখ্যাহীন দল উপদল। এত বিচিত্র উপাদান নিয়ে কেমন করে গঠিত হবে একটি সুসংহত জাতি ও রাষ্ট্র—এই

দেশের সামনে সমস্যা। স্বাধীনতা লাভের পরে এই সমস্যাটি যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও এর গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর 'হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধে এই সমস্যার উপরে তিনি যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য এই : দেশের এত বৈচিত্র্য ও জটিলতা যথাসম্ভব অস্বীকার করে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ সরল মীমাংসার দিকে আমাদের কারো কারো মন যেতে পারে; কিন্তু সে-পথে এই সমস্যার মীমাংসা সহজ হবে না, বরং আরো কঠিন হবে। বৈচিত্র্য যেখানে যথার্থই আছে সেখানে তাকে স্বীকার করতে হবে—স্বীকার করেই তার মীমাংসার চেষ্টা করতে হবে। যেমন হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় ও মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপনা। আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত দেশের অগ্রগতির সঙ্গে এর যোগ ঠিক নেই। কিন্তু হিন্দুর বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তা-ধারা আর মুসলমানের বিশেষ জীবনধারা ও চিন্তাধারা যখন যথার্থই আছে, তা যখন মায়া নয়, তখন তা যথাসম্ভব ভাল রূপে পাক এই সবার চেষ্টা হওয়া উচিত। ভাল রূপ বলতে কি বোঝায় তার নির্দেশ পাওয়া যায় কবির এই উক্তি থেকে—

> বিশেষত্ব বর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দুদিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

অর্থাৎ বিশেষত্বকে স্বীকার করতে হবে আর এমন আয়োজন করতে হবে যাতে সেই বিশেষত্ব মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে পারে, অন্য কথায়, দেশের সাধারণ জীবনধারার বাধা না হয়ে মহৎ সহায় হতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তা-ভাবনার বৈশিষ্ট্য স্থান পাক, সেই সঙ্গে 'বিশ্ব' অর্থাৎ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান বলে যা পরিচিত তাও স্থান পাক। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের তাদের পুরোনো জায়গায় অনড় হয়ে বসে থাকা আর সম্ভবপর হবে না, বিশ্বের যা শ্রেষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা তার স্পর্শ পেয়ে তারাও যোগ্যভাবে বদলাবে।

লক্ষ্য করবার আছে কবি দেশের লোকদের প্রাচীন সংস্কার সরাসরি বদলাতে চাননি, কিন্তু সে সবকে সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন মহত্তর জীবন-চেতনার দ্বারা।

হিন্দু ও মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় দেশে স্থাপিত হয়েছে। বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থানও সে-সবে হয়েছে। কিন্তু ফল আশানুরূপ হয়েছে কি? কেউ কেউ বলতে পারেন, এই প্রশ্ন করবার সময় এখনো হয়নি। তা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু কবির মূল যে ইংগিত—বিশেষত্বকে মহত্ত্বে উত্তীর্ণ করতে হবে—সেটি যেন দেশের হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান বাঙালী মান্দ্রাজী মারাঠী পাঞ্জাবী কেউ কখনো না ভোলে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সচেতন ছিলেন ব্যক্তির জীবনের মূল্য সম্বন্ধে তেমনি যৌথ-জীবনের মূল্য সম্বন্ধেও। অল্পদিনে রাশিয়ায় যৌথ জীবনের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে দেখে তিনি গভীর আনন্দ লাভ করেছিলেন; তাঁর বিখ্যাত "রাশিয়ার চিঠি"র এক জায়গায় এই মন্তব্যটি রয়েছে—

> রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো। এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভাল মন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয় কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে কত ট্যাক্সো আদায় করে তার তহবিল হয়ে উঠেছে

> পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে; ভয় ভাবনা সংশয় কিছু মনে নেই।

কিন্তু রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ব্যক্তির মূল্য যে কম এটি তিনি ভাল বলে মেনে নিতে পারেননি, সে-সম্বন্ধেও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট—

> শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না।

অন্যত্র—

> সন্দেহ নেই যে, একনায়কতার বিপদ আছে বিস্তর, তার ক্রিয়ার একতানতা ও নিত্যতা অনিশ্চিত, যে চালক ও যারা চালিত তাদের মধ্যে ইচ্ছার অসম্পূর্ণ যোগ-সাধন হওয়াতে বিপ্লবের কারণ সর্বদাই ঘটে। তাছাড়া সবলে চালিত হওয়ার অভ্যাসে চিত্তের ও চরিত্রের বলহানি করে—এর সফলতা যখন বাইরের দিকে দুই-চার ফসলে হঠাৎ আঁজলা ভরে তোলে, ভিতরের শিকড়কে দেয় মেরে।

তিনি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে গেছেন সমবায়নীতির প্রতি—

> আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে পল্লীতে ধনউৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক এই আমি কামনা করি।

আমাদের গ্রামগুলোর উন্নতি সম্পর্কে তাঁর এই উক্তিটি খুব অর্থপূর্ণ—

> আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনো ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেই রকম সংস্কার, বিদ্যা, বিশ্বাস ও কর্ম যা গ্রামসীমার বাইরের সঙ্গে বিযুক্ত—বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে যা কেবলমাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ। বর্তমান যুগের বিদ্যা ও বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্বব্যাপী, যদিও তার হৃদয়ের অনুবেদনা সম্পূর্ণ যে-পরিমাণে ব্যাপক হয়নি। গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে-প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।

মানবপ্রকৃতি কোনোদিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না হোক এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার বিষয় আর এ সম্বন্ধে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। অসহযোগ আন্দোলনের দিনে দেশের সবাইকে চরকা কাটতে বলা হয়েছিল; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি অসাধারণভাবে শ্রদ্ধান্বিত হয়েও তিনি সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন, কেননা তাঁর ধারণা হয়েছিল এমন একঘেয়ে কাজে অন্য লাভ যাই হোক মনের উৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই।

মানুষের মহত্তর পরিণতিতে তাঁর অশেষ আস্থা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর অপূর্ব 'নারী' প্রবন্ধটিতেও।

রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে কবি আর জীবন-জিজ্ঞাসু। কবি রূপে তিনি চিরদিন আনন্দ প্রকাশ করেছেন সৌন্দর্যে—যেমন প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যে, তেমনি মানুষের মনের অন্তহীন সৌন্দর্যে। মানুষের ক্ষুদ্রতা ও ব্যর্থতা দুঃখও দিয়েছে তাঁকে খুব—তারও মূলে সৌন্দর্যবোধ। আর জীবন-জিজ্ঞাসুরূপে তিনি ভেবেছেন জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কথা, সম্মুখীন হয়েছেন জীবন সম্বন্ধে এই সব মূল প্রশ্নের : বেঁচে থেকে কি করবো? ধর্ম কি? ঈশ্বর কি? দশের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? বিশ্বের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ? আমার আমিত্ব আমি চাই, না বিলুপ্ত করতে চাই? আমার আমিত্ব, অর্থাৎ সবার

আমিত্ব, সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন রূপে সার্থক হবে? এই সব মূল প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী সাহিত্য-প্রচেষ্টায়। তাই প্রচলিত অর্থে সমাজ-তত্ত্ববিদ্ বা রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ তিনি নন। তিনি সমাজতত্ত্ববিদ্ ও রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্ যেহেতু তিনি ব্যাপক-জীবন-জিজ্ঞাসু—কেমন করে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনের যোগ্য লালন-ক্ষেত্র হবে সেই তত্ত্বও তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছে। সর্বোপরি তাঁর জিজ্ঞাসার বিষয় হয়েছিল তাঁর কালে তাঁর দেশের জীবন—তাতে রাষ্ট্র, ব্যক্তি, দেশের বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়, বহুতর দেশ ও জগৎ, সবের বিভিন্ন ও মিলিত সমস্যা কি, এই সব। এ-সবের এমন উত্তর তিনি খুঁজেছিলেন যাতে শুধু তাঁর কালেরই নয় সর্বকালের মানবমন খুশী হতে পারে। এই থেকেই তাঁর চিন্তার মর্যাদা।

রবীন্দ্রনাথের যে মূল চিন্তা—জীবনের সুমহৎ পরিণতি—শিক্ষা সম্বন্ধে সেইটি যে তাঁর প্রধান চিন্তা হবে এ স্বাভাবিক, কেননা, শিক্ষা সম্বন্ধে এইটি বা এর অনুরূপ চিন্তা দেশদেশান্তরের মনীষীদের প্রধান চিন্তা।

রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তাই প্রকাশ পেয়েছে এই মহৎ উদ্দেশ্যযুক্ত শিক্ষার জন্য তিনি যে আয়োজন করেছেন বা করতে চেয়েছেন তাতে। এক্ষেত্রে, অন্ততঃ আমাদের দেশে, তাঁর দান অসাধারণভাবে মৌলিক।

স্কুল কলেজে শিক্ষা তাঁর নিজের খুব কমই হয়েছিল। সেজন্য নিজেকে তিনি বলেছেন স্কুলপালানো ছেলে। কিন্তু পুরোপুরি স্কুলপালানো ছেলে তাঁকে বলা যায় না, কেননা, স্কুল থেকে তিনি পালিয়েছিলেন বটে কিন্তু বই থেকে পালাননি। তাঁর নিজের জীবনে এইযে তিনি স্কুলের বন্ধনকে স্বীকার করেননি অথচ পড়তে কম আগ্রহবোধ করেননি, আর জল স্থল আকাশ সূর্যোদয় এসব যে ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী—অসীম আনন্দ ও উল্লাসভরা সঙ্গী, মুখ্যতঃ তাঁর নিজের জীবনের এইসব অভিজ্ঞতা থেকেই রূপ পেয়েছে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনা।

বলা যেতে পারে শিক্ষা সম্বন্ধে কবির প্রধান চিন্তা হচ্ছে এই সব : মানুষের, বিশেষ করে বালকবালিকাদের, দেহমনের বিকাশের উপরে প্রকৃতির প্রভাব; শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার অনুপযুক্ততা; শিক্ষার, তথা জীবনের, লক্ষ্য সম্বন্ধে দেশে চেতনার অভাব; শিক্ষার বিকিরণে বিচিত্র বাধা।

শিক্ষা সম্বন্ধে কবি জোর দিয়েছেন প্রধানত পরিবেশ ও শিক্ষকের উপরে। পাঠ্যতালিকা, শিক্ষণ-রীতি এসবও তাঁর মনোযোগ কম আকর্ষণ করেনি; কিন্তু তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে শিক্ষার যোগ্য পরিবেশ রচনা, যোগ্য শিক্ষক লাভ, এই দুয়ের দিকেই, এই মনে হয়। শিক্ষার ব্যাপারে এই দুয়ের বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে।

মানুষের দেহ হৃদয় ও মনের বিকাশে প্রকৃতির আনুকূল্য কত অর্থপূর্ণ সে সম্বন্ধে কবির একটি বিখ্যাত উক্তি এই—

> খোলা আকাশ খোলা বাতাস এবং গাছপালা মানবসন্তানের শরীর মনের সুপরিণতির জন্য যে অত্যন্ত দরকার একথা বোধ হয় কোনো কেজো লোকেরাও একেবারেই উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। যখন বয়স বাড়িবে, আপিস যখন টানিবে, লোকের ভিড় যখন ঠেলিয়া লইয়া বেড়াইবে, মন যখন নানা মতলবে নানা দিকে ফিরিবে তখন বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ হৃদয়ের যোগ অনেকটা বিচ্ছিন্ন

> হইয়া যাইবে। তাহার পূর্বে যে জলস্থল-আকাশ বায়ুর চিরন্তন ধাত্রী-ক্রোড়ের মধ্যে জন্মিয়াছি, তাহার সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচয় হইয়া যাক, মাতৃতন্যের মতো তাহার অমৃতরস আকর্ষণ করিয়া লই, তাহার উদার মন্ত্র গ্রহণ করি, তবেই সম্পূর্ণ রূপে মানুষ হইতে পারিব। বালকদের হৃদয় যখন নবীন আছে কৌতূহল যখন সজীব এবং সমুদয় ইন্দ্রিয়শক্তি যখন সতেজ তখনই তাহাদিগকে মেঘ ও রৌদ্রের লীলাভূমি অবারিত আকাশের তলে খেলা করিতে দাও—তাহাদিগকে এই ভূমার আলিঙ্গন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়ো না।.....হে প্রবীণ অভিভাবক, হে বিষয়ী, তুমি কল্পনাবৃত্তিকে যতই নির্জীব, হৃদয়কে যতই কঠিন করিয়া থাক, দোহাই তোমার, একথা অন্তত লজ্জাতেও বলিয়ো না যে, ইহার কোনো আবশ্যক নাই; তোমার বালকদিগকে বিশাল বিশ্বের মধ্য দিয়া বিশ্বজননীর প্রত্যক্ষ লীলা-স্পর্শ অনুভব করিতে দাও—তাহা তোমার ইন্‌স্‌পেক্টরের তদন্ত এবং পরীক্ষকের প্রশ্ন পত্রিকার চেয়ে যে কত বেশি কাজ করে তাহা অন্তরে অনুভব কর না বলিয়াই তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষা করিয়ো না।

আমাদের দেশ পল্লীপ্রধান। কাজেই আমাদের দেশের লোকেরা এতদিন সহজভাবেই প্রকৃতির কোলে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু ইংরেজ শাসনের কালে দেশের অবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন ঘটলো। শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলো বেড়ে উঠতে লাগলো, সে সবে অনেকে অতি-শ্রীহীনভাবে ভিড় জমালো। আর রাজভাষা ইংরেজি আমাদের মনোযোগ অতিরিক্ত পরিমাণে আকর্ষণ করলো। অথচ ইংরেজিবিদ্যা যা আমাদের লাভ হ'ল অনেকক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত খুতো—সভ্য মানুষের জন্য অশোভন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, দেশের জীবনে যে এতখানি অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে-সম্বন্ধে চেতনার পরিচয় পাওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ দেশের সামনে তাঁর অতিশয় অর্থপূর্ণ শিক্ষাদর্শন ব্যক্ত করলেন। অতিশয় অর্থপূর্ণ আমরা বলছি এই জন্য যে অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়া কি ব্যক্তি কি জাতি সবারই জন্য একটা বড় রকমের মুক্তি। অবশ্য সেই মুক্তি যে আমরা পুরোপুরি পেয়েছি তা বলা যায় না। তবে আমাদের শিক্ষার অবস্থার অস্বাভাবিকতা সম্বন্ধে অনেকখানি চেতনা দেশের শিক্ষিত মহলে দেখা যাচ্ছে এ মিথ্যা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, মাতৃভাষা আজ আর অবহেলিত নয়—তার গৌরবের আসন লাভ হয়েছে, অবশ্য যদিও তার যথোচিত বিকাশের এখনো ঢের বাকি। ব্যাপক জনশিক্ষার জন্যেও চেষ্টা হচ্ছে।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের পারিবারিক যেসব বড় বাধার কথা কবি বলেছেন, যেমন, পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের উৎকট সাহেবিয়ানা, সে সবও আজ বদলে গেছে বলা যায়। উৎকট সাহেবিয়ানা আজ আর দশজনের সরব বা নীরব বাহবা পায়না যদিও কিছু বেশী বিত্তশালীদের চালচলন আজো আপত্তিকর। তবু আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ও চালচলন যে পরিবারের বালকবালিকাদের সুশিক্ষার অনুকূল হয়েছে এমন কথা বলার দিন আসতে এখনো বহু দেরী। কিন্তু তার কারণটি একটি বড় ব্যাপার, সংক্ষেপে বলা যায় সেটি হচ্ছে—আমাদের জীবনে চিন্তা আশা সংকল্প সবেরই অস্পষ্টতা বা ক্ষীণতা। এ সম্পর্কে কবির উক্তি এই—

> আমার কোনো-এক বন্ধু ফলিত জ্যোতিষ লইয়া আলোচনা করেন। তিনি একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যেসব মানুষ বিশেষ কিছুই নহে, যাহাদের জীবনে হাঁ এবং না জিনিসটা খুব স্পষ্ট করিয়া দাগা নাই, জ্যোতিষের গণনা তাহাদের সম্বন্ধে ঠিক দিশা পায় না, তাহাদের সম্বন্ধে শুভগ্রহের ও অশুভগ্রহের ফল কী

তাহা হিসাবের মধ্যে আনা কঠিন। বাতাস যখন জোরে বহে তখন পালের জাহাজ হুহু করিয়া দুইদিনের রাস্তা একদিনে চলিয়া যাইবে, একথা বলিতে সময় লাগে না; কিন্তু কাগজের নৌকাটা এলোমেলো ঘুরিতে থাকিবে, কি ডুবিয়া যাইবে, কি কী হইবে তাহা বলা যায় না—যাহার বিশেষ কোনো একটা বন্দর নাই তাহার অতীতই বা কী আর ভবিষ্যৎই বা কী।.....

কোনো সমাজ সকলের চেয়ে বড় জিনিস যাহা মানুষকে দিতে পারে তাহা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশার পূর্ণ সফলতা সমাজের প্রত্যেক লোকেই যে পায় তাহা নহে; কিন্তু নিজের গোচরে এবং অগোচরে সেই আশার অভিমুখে সর্বদাই একটা তাগিদ থাকে বলিয়াই প্রত্যেকের শক্তি তাহার নিজের সাধ্যের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে। একটা জাতির পক্ষে সেইটেই সকলের চেয়ে মস্ত কথা।.....

.....শিক্ষা জিনিসটা তো জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা কৃত্রিম জিনিস নহে। আমরা কি হইব, এবং আমরা কী শিখিব, এই দুটো কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। পাত্র যত বড়ো জল তাহার বেশি ধরে না।

চাহিবার জিনিস আমাদের বেশি কিছু নাই। সমাজ আমাদিগকে কোনো বড় ডাক ডাকিতেছে না, কোনো বড় ত্যাগে টানিতেছে না।.....

রাজশক্তিও আমাদের জীবনের সম্মুখে কোনো বৃহৎ সঙ্করণের ক্ষেত্র অবারিত করিয়া দেয় নাই।.....

তুমি কেরানির চেয়ে বড়ো, ডেপুটি-মুন্সেফের চেয়ে বড়ো, তুমি যা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউইয়ের মতো কোনোক্রমে ইস্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেন্‌সনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা—এই কথাটা আমাদের নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো মূঢ়তা। আমাদের সমাজে একথা আমাদিগকে বোঝায় না, আমাদের ইস্কুলেও এ শিক্ষা নাই।

মানুষের দেহমনের সুপরিণতিতে প্রকৃতির সংস্পর্শ গভীরভাবে অর্থপূর্ণ—শিক্ষার ক্ষেত্রে কবির এই চিন্তা যেমন মহামূল্য, তেমনি মহামূল্য তাঁর এই চিন্তা যে আশা লক্ষ্য সংকল্প এসবের অভাব ঘটলে মানুষের জীবন হয় স্রোতের 'পরে কাগজের নৌকার মতো অর্থহীন ক্ষণিকের খেলনা। প্রকৃতির প্রভাবের মহিমা আর আশা লক্ষ্য ও সংকল্পের নীরব মহিমা তিনি মূর্তিমন্ত দেখেছিলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের গুরু ও শিষ্যদের জীবন-যাত্রায়। সেই মহৎ আদর্শের একালের উপযোগী রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমে।

তাঁর প্রচেষ্টা কতটা ফলবতী হয়েছে তার চাইতেও বড় প্রশ্ন, তাঁর পরম অর্থপূর্ণ উপলব্ধি ও লক্ষ্য অনুধাবন করতে আমরা কতটা প্রয়াসী হয়েছি।*

* সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর ধর্ম রাষ্ট্র শিক্ষা খণ্ডের ভূমিকা।

কবিতা

যদি একবার

মণীন্দ্র রায়

তুমি আজ কাছে নেই, তবুও আমার
মনের জানালা খুলে অন্ধকার দূরের হাওয়ায়
পাই স্নিগ্ধ তোমারই সুরভি।
একটি অস্তিত্ব তুমি, তবুও স্মৃতির চোখে চোখে
ঢেউয়ের জ্যোৎস্নার মতো হাজার হীরায়
কতো চেনা রূপে-রূপে ভেসে ওঠো—মৌন চলচ্ছবি।

আমার সমস্ত মনে তোমারই নামের
বৃষ্টি ঝরে। সব ধূলিকণা
মেলে ধরে অভীপ্সার ময়ূরকলাপ।
আর তুমি উদাসীন, এ দিগন্ত ছেড়ে
কোথায় চলেছ? কোন অরণ্যের টানে
বাষ্পনীল তোমার উত্তাপ!

আমাকে চাও না জানি। তবু একবার
যদি দেখে যেতে তুমি, পরিত্যক্ত তোমারই এ ঘরে
কতো ভাঙাচোরা কথা, অশ্রু, হাসি, চোখের চাওয়ায়
কী তীব্র আবেগে বেঁধে, গড়ে তুলি মূর্তি কবিতার।
একবার যদি তাকে বুকে নিতে, হয়তো তখনি
স্নায়ুর বিদ্যুতে, রক্তে, জেনে যেতে—কী তুমি আমার!

সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে

বিষ্ণু দে

বাগান ভরেছে ফুলে, আলোয় আলোয়,
শাদা, লাল, নীল, হলুদ, নানান্ রঙে ফুলে ফুলে ফুলময়।
আর পল্লবেও, হরেক সবুজে, আলোর সরস স্পষ্টতায়।
সমস্ত বাগান ছেয়ে রং আর গন্ধের বাহার,
বাগানে, ঘরেও, বাহিরে অন্দরে, জানলায় বারান্দায়
টবে ছাতে সর্বত্র গন্ধের ইন্দ্রধনুর সম্ভার,
বর্ষার শান্তির আর সচ্ছল হিমের আসন্ন হাওয়ায়
পাপড়ির বিচিত্র ঢঙে, কেশরের নানাভঙ্গে সাজে।

কে বলে কয়েক বিঘা!
ভিতরে থাকো তো দেখো, মনে হবে
সারাটা পৃথিবী যেন খুঁজে পাওয়া যায়
অক্টোবরে প্রাণের গৌরবে জানলায় বারান্দায়
আর বাগানে উঠানে, যেমনটি পাওয়া যায় গানে গানে
পলি বালি জলে ধোয়া সোনার বাংলায়।
আকাশের নীল তীরে তীরে অসীম উজানে যে বাঁশী বাজায় তাতে
চোখ ভাসে ফুলের হাওয়ায় মুক্ত রঙ্গে দুলে দুলে।
পশ্চিমের পাহাড়ের কঠিন ভঙ্গিমা
সীমা পাবে আঁকাবাঁকা ফুলমতী-পাড়ে,
এমন কি পাঁচিলের পারে লাল পথটাও
রঙের বিন্যাসে মনে হবে উল্লসিত ইতিহাস,
অন্য এক সাহসের সেজানের আঁকা।
বর্ষার অশ্রুতে আর রৌদ্রের ধিক্কারে
মানুষের সঙ্কল্পে ও দৃঢ়শ্রমে
সোরা ক্ষারে সারে হাড়ের ধূলায় ক্রমে ক্রমে
আমাদের বাগানের আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই
কয়েকহাজার মৃত্যুঞ্জয় গাছ আর লক্ষ লক্ষ ফুলের মহিমা।

ঘুরে ফিরে চোখের বিরাম নেই, ঘ্রাণেরও,
নিশ্বাসে নিশ্বাসে নেই বুঝিবা বিশ্রাম প্রাণেরও,
যেদিকে তাকাই সবুজ আস্তরে থরে থরে
রঙে গন্ধে কলিজা অবধি প্রাণ ভরে।
এমন কি চোখ যেন গান করে

পাহাড়ে কষ্টিতে, লাল পথে,
আকাশের নীল স্রোতে, শরতের অশরীরী শুভ্র মেঘে,
যেদিকে তাকাই গান, রঙে গন্ধে গান আর গান,
না শুনে থাকাই ভার, থামিয়ে রাখাই ভার।
সারাদিন ধরে এই, ভোরাই ভয়রোঁয়,
রাখালী সারঙে কিংবা ঘরেফেরা পূরবী খাম্বাজে।

কয়েক হাজার গাছে নানা সাজে এল অক্টোবরে
আনন্দ, আনন্দই বা প্রত্যাশী প্রসাদ,
শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে বা পুরুষ প্রত্যেকের দেয়
আর প্রত্যেককে দেয়,
বাগানে বাগানে ঘরে ঘরে
যেন সে বিজয়ী বধির আপ্লুত সঙ্গীতের
—বেনেডিক্‌টস, বেনেডিক্‌টস্—
সামগ্রিক ঐশ্বর্যের যুক্ত সপ্ত স্বরে
মানবিক উত্তরণে মনের বৈভব।

জানি এর তলে তলে বহু অশ্রুভরা বেদনায়
বহু মৃত্যু আকুলতা, বহু স্মৃতির আমেজ,
দূর ও নিকট বহু দীর্ঘ ইতিহাস, সুদূরের মিতা ওগো মিতা,
মেঘ রৌদ্র, রক্তময় শ্রম, গবেষণা, অনেক দিনের চিতা,
ধূলা, মাটি, কাদা, বহু হাড়ের পাহাড় অন্তরে অন্তরে।
জানি ফুল মাটির জঠরে, পুঞ্জল তিমিরে চেতনায়
খোঁজে আপন আকাশ।
কাঁকরে, কাদায় শিকড়ের গোপন বিস্তারে
প্রাণ পায়, চলে যায় নিরেট মাটির ফাঁকে
বিকাশের অন্ধকারে, এমন কি পারলৌকিক স্তরে,
এমন কি আগ্নেয় স্মৃতির গ্রানিট্ পাথরে,
হাতে হাতে পায়ে পায়ে শিকড়ে অঙ্কুরে
জোগায় রঙের গন্ধের রসদে রসদে সরস
অবশাম্ভাবিতার অবাক্‌শাখায় পরাগের ঊর্ধ্বমূল স্তব।

আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে
সর্বত্র বাস্তব,
অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে॥

চৈত্রসন্ধ্যা

অশোকবিজয় রাহা

দাউ দাউ সূর্যশিখা—ধু ধু হাওয়া—চৈত্রসন্ধ্যা জ্বলে,—
পলাশে শিমুলে
বসন্তের রক্তদীপ,
পথের দু ধারে
কৃষ্ণচূড়া আগুন ছড়ায়।

নির্জন মাঠের পারে শালবীথিপথে
চুপি চুপি কে এসে দাঁড়ায়
অবাক স্বপ্নের মতো :
বুকে লাল চেলি
মুখে চুলে সন্ধ্যার আবির।

একটি মুহূর্ত জ্বলে—
তারপর হঠাৎ মিলায়,
চেয়ে দেখি সূর্য ডুবে গেছে,
ধূসর আকাশে
চেয়ে আছে শূন্য শালবীথি।

চারদিক চুপ,
ভেসে আসে ঝাউয়ের মর্মর,
দূর আমবনে
ডাকে এক নিঃসঙ্গ কোকিল,
এ পৃথিবী কবে একদিন
দেখেছিল বসন্তসেনাকে?

স্বপ্ন কেটে যায়,—
ধু ধু হাওয়া ধুয়ে যায় বন,
ডেকে ওঠে অশান্ত পাপিয়া,
চোখ পড়ে দূরে—
চৈত্রপূর্ণিমার চাঁদ লেগে আছে মহুয়ার ডালে।

কনখল

মনীশ ঘটক

আয়েষা বেশ ক'দিন আসেনি। কনখলের মন বলে, ও আর আসবে না। অন্তরঙ্গ খেলার সাথী থেকে যে মেয়ে হঠাৎ বড়ো হয়ে যায়, সে পর হয়ে যায়, এই কথা দৃঢ়বদ্ধ হয় ওর মনে। নিজেই'ত বলে গেছে আমি এখন বড়ো হয়ে গিয়েছি। এক এক সময় হতাশ লাগে কনখলের, কিন্তু হার মানতে চায় না যেন মন। ওকে জব্দ করার সঙ্কল্পও উঁকি-ঝুঁকি দেয় মনে। অমৃত আর ব্যাঙার সাহচর্যে মেতে থাকে, কাঞ্চনকে নিয়েও বেশী সময় কাটায়, কিন্তু স্কুলের বাইরের সময় কি লম্বা, কাটতে চায় না। থেকে থেকে উদাস হয়ে ওঠে।

ছেলের ভাবান্তর নিভাননীর চোখ এড়ায় না। কারণ'ত জানেনই, কিন্তু সে সব কথা আদৌ তোলেন না। কনখলও যেন বড় তাড়াতাড়ি বয়স্ক হয়ে উঠছে। ছেলে হঠাৎ এসে একদিন যখন বলল,—মা, ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করার কথার কি হোলো?

—সে কিরে, সামনে পুজোর ছুটি, এখন ভর্তি হলে কি লাভ হবে? আর তা ছাড়া, ওরও'ত বাবা মা আছে, তারা যদি এসব পছন্দ না করে। সবাই কি সব করতে পারে?

—কেন পারবে না—ওতে আমাতে তফাৎ কি মা? ও খুব চালাক, দেখো কেমন চটপট সব শিখে উঠবে।

নিভাননী তত্ত্ববিশ্লেষণে তৎপর হন না। ব্যাঙার সাথে নিজের ছেলের সমত্ববোধে বিব্রত হন। যে সমাজে কাউকে বকতে হলে বলতে হয় 'ব্যাটা ছোট লোক' 'ব্যাটা চাষা'—সেই সমাজে বাস করে একজন দাগী চোরের অশিক্ষিত ছেলের সাথে নিজের ছেলেকে সমান বলে ভাবতে বিপ্লুত বোধ করেন। এ অস্বস্তির সমাধান কি ভেবে কুল পান না। ধমক গালাগালি দিয়ে থামানো যায় এ অসঙ্গত আবদার, কিন্তু নিজের মনেও কোথায় একটা যথার্থের খোঁচা ফুটতে থাকে। অনুদার হতে চান না, তাই অসহায় বোধ করেন। আপাততঃ কথাটা থামিয়ে দেন, বলেন,—আচ্ছা দেখব। বাবাকে বলতে হবে ত, নইলে আমি একা করব রে।

কনখলের রাজ্য জয় ঐখানেই শেষ হয়। মা যদি বাবাকে বলেন, তিনি কি আর আপত্তি করবেন।

কনখল একটা তেলতেলে ডাল পেয়ারা গাছে গিয়ে ওঠে। পেয়ারাগুলোর বাইরে সবুজ, ভেতরে লাল। বীচি নেই বললেই হয়। সেখান থেকে একটা, দুটো, তিনটে পেয়ারা ছুঁড়ে মারে বাবুর্চিখানার সামনে দাঁড়ানো ব্যাঙাকে তাক ক'রে। ব্যাঙা তাকাতেই বলে,—আয়।

ব্যাঙা এসে কাঠবেড়ালীর মতো গাছে উঠে কনখলের পাশের ডালে বসে। দুইজন সমানে সমানে পেয়ারা ধ্বংস করে। বাড়ীর বারান্দায় বসে নিভাননী দুশ্চিন্তা করতে থাকেন।

একদিনকার ছেলেমানুষী আবদার ছেলের মনে গভীর দাগ কেটেছে। বাগচির বদলির কাজ, ঠাঁইনাড়া হলেই হয়ত কনখল সব ভুলে যাবে। নিজে গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর মেয়ে, স্বামীর কাজে পাঁচমুলুকের জলখেয়ে আমলমাফিক হিন্দু মুসলমান সাহেব সবায়ের

সমাজেই অকুণ্ঠভাবে মিশে যেতে পেরেছেন। এ যখন সম্ভব হয়েছে, ছেলের দাবীর মধ্যেও সম্ভাব্যতা আবিষ্কার করতে বাগ্র হয় তাঁর মন। ধর্মমত যাই হোক না কেন, জীবনের সকল সুখসুবিধায়ই সাধ্যমত সবায়েরই সমান অধিকার আছে এই ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তবে হ্যাঁ, রাজা জমীদার আর সাহেব সুবো তাদের কথা আলাদা, একদলের অনেক টাকা, আর একদল দেশের রাজার জাত। স্বদেশী আন্দোলনের খোঁজখবর রাখেন, মনে বিশ্বাস আছে, শেষোক্ত দলের সুখসুবিধার কিছুটা অন্তত একদিন দেশবাসীর হাতে আসবে। মনের বিশ্বাস মনেই রাখতে হয়, স্বামী যে শেষোক্ত দলের বেতনভোগী।

বাগচি ফিরলে আর কিছু বলেন না, বলেন শুধু ব্যাঙাকে স্কুলে দেওয়ার কথা। শুনে তিনি হা হা করে হাসেন, বলেন,—এইবারে পুত্র মারফৎ আমাদের সাথে পাল্লা দেওয়ার লোকের সৃষ্টি হতে থাকবে। ঠাট্টা করেই বলেন। তার পরেই গম্ভীর হয়ে যান। জীবন কী রাজনীতি কিছুই তোলেন না আলোচনায়। শুধু বলেন,—হ্যাঁ, পারতপক্ষে উচ্চশিক্ষায় সকলেরই অধিকার থাকা উচিৎ। আচ্ছা, দেব ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করে। ছেলেটা চালাক চতুর আছে ত? কিন্তু ওর বাবা যে দাগী চোর, কোনো স্কুল নেবে কি? দেখি হরেন কি বলে। ওর মাথায় অনেক রকম খেলে।

চা খেতে বসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যান হৃষীকেশ। নিভাননী হৃষীকেশের সামনে রুটির পায়েসের বাটিটা এগিয়ে দিতে দিতে বলেন,—কি হোলো আবার?

—স্বদেশী মামলায় কনা রাজার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়ে এসেছে।

—কখন? কবে? কোন স্বদেশী মামলায়?

—ঐ প্যারীবাবুর মামলায়। না না, ঠিক সাক্ষী নয়, তবে হ্যাসেট ওকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল। ও যা বলেছে, তাতে সরকারী মামলা ফেঁসে যাবে, স্বদেশীর দল খালাস পাবে, আর প্যারীবাবুর সাজা হবে।

—এত কাণ্ড ঘটল কবে? আমি ত কিছুই জানিনে।

—এখন যে ভোরে উঠে কান্ধনকে জিন কসে পোলো ময়দানে যায় মাঝে মাঝে, এটা জানো?

—তা ত জানি। সে ত যায় আয়েষার সন্ধানে। তার সাথে—

—বলতে দাও। হ্যাসেট ওকে ভালোবাসে। ময়দানের মোড়ে ধরে ওকে জিজ্ঞেস করেছে, কাজীর বাজারে আগুন লাগার ব্যাপারে ওর কি মনে আছে। ও বলেছে অনেক অবান্তর কথা, কিন্তু একটি কথায় মামলা ফাঁসবার উপক্রম। বলেছে, আগুন লাগার রাতে প্যারীবাবুর গুদামে এক কণা পাটও ছিল না। খবরদাতা প্যারীবাবুর পত্নী, খবরের মাধ্যম তুমি, এবং তুমি আমাকে যখন বলো, ও যে কোথায় থেকে শুনে নিয়েছে, জানতুম না। হ্যাসেট বলেছে, চিলড্রেন আর গড। মিছে কথা জানে না। যা সত্য তাই বলেছে। আর হয়েছে কি, সেই কথাটা ও নাকি প্রকাশের কাছে বলে ফেলেছিল একদিন।

নিভাননীর মনে পড়ে যায় হাসপাতালে প্রকাশের কাছে খাবার নিয়ে যাবার দিনের কথা। মিছে কথা বলতে শেখেনি এখনো কখু, সেইদিনই তাঁকে বলেছিল সব কথা খোলসা করে। বলেছিল বেণী দারোগার পেছনে 'বন্দেমাতরম' বলার কথা। তাঁর মন হঠাৎ সমস্ত ইংরেজ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। দৃপ্ত গ্রীবা উঁচু করে বলেন,—যদি বলে থাকে, ঠিক বলেছে। আগুন লাগার পরের ভোরে ঊষা এসে আমায় বলেছিল, প্যারীবাবুর গুদামে এক কণা পাটও ছিল না। হাজিরার টেবলে আমি তোমায় বলেছিলাম। কনা

চুপ করে শুনেছে। ও যা শুনেছে, শুধু রং না ফলিয়ে সেইটুকুই বলে থাকে, তবে সত্যি কথাই বলেছে। তুমি নিজে সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বলোনি, যে প্যারীবাবু তোমার কোর্টে আসামী হয়ে এলে তাঁর সাজা হয়ে যাবে?

হৃষীকেশ আম্‌তা আম্‌তা করেন। বলেন,—হ্যাঁ, ঐরকম একটা কিছু বলেছিলাম বটে, তখন বুঝিনি ফায়ারম্যেরিন বাঁমা কোম্পানীর সাহেব ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট ও কনা যা বলেছে তারই সমর্থন করবে। সেই সাহেবটা বলে গেছে, প্যারীবাবু খালি গুদামে কেরোসীন ছিটিয়ে নিজে আগুন দিয়ে সমস্ত কাজীর বাজার জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার সহকারী ছিল একজন কয়ালী সর্দার। কিন্তু এ যে ভীষণ অপরাধ। ফাঁসী কি যাবজ্জীবন, যে কোনো একটা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু,—

একটু ভাবিত মুখে গোঁফে চাড়া দেন বাগচি।

নিভাননী আজ বহুদিন পরে সকৌতুকে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেন,—যা ভালো মনে হয় করো। কংখ সত্যি কথা বলেছে। এ ব্যাপারে তোমরা রাজাগজারা যা খুশী করবে। আমার ছেলে সত্যি বলেছে, এ গর্ব আমার কোনো দিন মন থেকে মুছবে না। সত্যির আদর যদি শাস্তি হয়, চাকরী ছেড়ে প্রফেসরি নিয়ো। ছেড়ে এসে তো ঢুকেছিলে গোলামখানায় একদিন। আবার না হয় কয়েদমুক্ত হয়ে নিজের বিদ্যার জোরে দাঁড়াও।

হৃষীকেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কি কথা থেকে কি কথা এসে পড়লো। চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রুমালে গোঁফ মুছে উঠে দাঁড়ান। বলেন,—আচ্ছা, হবে হবে। ঐ ত হরেন আর বিদ্যাভূষণ মশায় এসে পড়েছেন। রহমৎ, সব চৌকী তেপাই বাইরে—

—হুজুর বিলকুল তৈয়ার। পণ্ডিতজী তাম্বাকু খাচ্ছেন।

—আমি চললুম। চা এবং টা—মারফৎ ঠাকুর।

হেসে ফেলেন নিভাননী। বলেন,—মনে না করালেও চলবে। তারপর মুখে একটা কঠিন ভাব আপনা থেকে এসে যায়। বলেন,—কখুকে জেরা করা হবে না। সে সত্যি কথা বলেছে।

হৃষীকেশ চোখ ফেরান। বলেন, আচ্ছা, আচ্ছা।

বাইরের বারান্দায় সেদিন আর কোনো আলোচনাই হয় না। হরেন চাকী মশাই ভেতরের সব হদিস রাখেন না। বলেন,—ওহে সাহেব, এ যে সাহেবে ইংরেজের মাথা খেলো। জানো তো আজকের খবর? নর্টন ত ফায়ার। রবার্টসনের ওখানে যে বাঁমা কোম্পানীর সাহেবটা এসেছিলো, সে তো প্যারীবাবুকে চরম আসামী সাব্যস্ত করে গেছে। বাঁমার ত্রিশ হাজার ত চাঙে উঠ্‌লো, এখন শ্রীঘর হওয়াও আট্‌কানো শক্ত। গীতা সোসাইটির চ্যাড়াদের বিরুদ্ধে মামলা ত এক জবানবন্দীতেই উড়ে গেছে। সাহেবদের একটা কি গুণ জানো সাহেব, যদি সাহেবে সাফাই সাক্ষী দেয়, তবে তাই বহাল থাকে, কালা দারোগা কিম্বা কসাইয়ের ছেলে পুলিশসাহেব, যতো তোড়জোড়ই করুক না কেন, বে ফয়দা। ঐ বাঁমা কোম্পানীর সাহেব শুধু প্যারীবাবুর দাবী আদৌ মিথ্যা বলে যায়নি, বলে গেছে তার কোম্পানীর বড়ো সাহেব ফুলারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, যদি এ কেসে কোম্পানীকে ত্রিশ হাজার খেসারৎ দিতে হয়, তবে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার অথবা উনিশ বিশ, বহু খাস ইংরেজকে কালাপানি পার হতে হবে। নর্টন ত চুপ্‌সে গেছে। এখন খালি গজরাচ্ছে বেণী দারোগা আর তার চ্যালাচামুণ্ডার ওপর। অকথ্য গালাগালি করছে।

হৃষীকেশ শুধু তাক মাফিক নজর রাখেন কনার অংশটুকু পরম বন্ধু হরেনের নজরেও

এসেছে কিনা। আসেনি দেখে আশ্বস্ত হন। বিদ্যাভূষণ পণ্ডিত মানুষ, মামলা মোকদ্দমার খবরও রাখেন না, অব্যাপারে মাথাও গলান না। প্রাকৃতে শুধু বলেন—খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে—

কথা শেষ করতে দেন না হরেন।—থামো হে পণ্ডিত, যদি খাচ্ছিলই, তবে আরো খাবার ইচ্ছে কেন? বুঝলে না, ঐ তৃতীয় পক্ষ, ঐ প্রকাশদের মার মার করে ওঠা, ঐ প্রতিশোধ প্রবৃত্তি, এই গেলো এক তরফ আর একদিকে যতদূর খবর রাখি ঝাঁজরা হয়ে আসছিল ভেরেজুরি, অর্থাৎ অর্থসামর্থ্য। এ দুটোর সমন্বয় করো, তবে সাহেবপেয়ারি প্যারীবাবুর কীর্তিকলাপের কিঞ্চিৎ হদিস পাবে।

বিদ্যাভূষণ হুঁকোয় টান দেন, ভুড়ুৎ। কথা বলেন না।

হরেন চিরকাল কান্ত কবির ভক্ত। হঠাৎ উত্তেজনা থামিয়ে বলে,

"আঃ যা করো বাবা আস্তে ধীরে—
ঘা করো কেন ঘুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?"

—আস্তে ধীরে চালিয়ে গেলে প্যারীবাবুও হয়ত একদিন সাগর পার হতে পারতেন। এটা বুঝলেন না, যে

"সোনার খনি দিয়ে বলো কি হবে বাবা;
থাকলে ধড়ে প্রাণ অনেকখানি পাবা;
কেন এ খোঁচাখুঁচি, পরান বধবধি?
কেন এ কাটাকুটি, রক্তে নদানদী?"

—একটা বাজারকে বাজার জ্বালিয়ে দিলেন, সেখানে তো অনেক মরলো, অনেক পুড়লো, মায় খাজাওয়ালার ন্যাংড়া মেয়েটা পর্যন্ত। তাতেও শেষ নেই, মহৎপ্রাণ যে ফটি ছেলে বাঁচাতে গেলো, পুলিশের সাথে যোগসাজস করে, তাদেরও ফাঁসাবার মলবব। আর একি সহজ ফাঁসানো? নিবারণের বিরুদ্ধে যা চার্জ খাড়া করেছিলো, ফাঁসী অবধারিত। এ টাইপের ক্রিমিনালরা সোশ্যাল মিনেস। একেবারে চরমদণ্ডের আসামী।

বিদ্যাভূষণ বলেন, হুঁ। বাগচি গোঁফে চাড়া দেন।

মামলার আলোচনা বেশীদূর আর এগোয় না। বাড়ীর ভেতরে চাপা কান্না আর নিভাননীর অস্ফুট স্বরে সান্ত্বনার আওয়াজ পাওয়া যায়। বারান্দায় তিনজনেই অস্বস্তি বোধ করেন। বিদ্যাভূষণ বলেন,—যাও হে, দেখে এসো পরিস্থিতি। আমরা উঠি।

হরেনবাবু মুখে যতোটা মারমুখী, অন্তরে ততটা নন। কেমন যেন উস্‌খুস্‌ করেন। কথা একটিও না বলে বিদ্যাভূষণের সাথে উঠে পড়েন। বাগচি একা বারান্দায় পায়চারী করেন। একবার উঁকি দিয়ে অন্দরে তাকান। ঊষা উপুড় হয়ে নিভাননীর কোলে পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, নিভাননী সান্ত্বনা দিতে গিয়েও যেন পাথর হয়ে গেছেন। শুধু মাথায় হাত বুলোচ্ছেন।

উত্তেজকের উল্টো পিঠ অবসাদে ভেঙে পড়া, সে উত্তেজনা কৃত্রিম হলে। সহজ সতেজ জীবনই শুধু সুখ দুঃখকে সমভাবে ধরে রাখতে পারে। একবার ইমাম সাহেবের কাছে যেতে হবে, ভাবেন বাগচি। কনখল কোথায়, কি করছে, কেউ খোঁজও রাখে না, দরকারও মনে করে না।

সমস্ত বাড়ীটার ওপর যেন একটা শোকের কফিন ঢাকা চাদর বিস্তৃত হয়।

ওদিকে কনখল বাবুর্চিখানায় গিয়ে রহমতের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। রহমৎ বলে, ঠাণ্ডা হও কনা বাবা, বলো কি হয়েছে। বুঢ়া রহমৎ তোমার দোস্ত্‌, কিচ্ছু ভয় নেই। কি চাও বলো।

কান্নার ধাক্কায় কনখল ফুলে ফুলে ওঠে। আথালি পাথালি করে, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। রহমৎ মাথায় গালে হাত বুলোয়। জানে, হালাল করা মুরগীর মতো ওর ছটফটানী থামবেই এক সময়।

থামেও। কনখল উঠে বসে রহমতের বুকে মুখ লুকিয়ে ফোঁপায়। বলে,—আমি কি করলুম রহমৎ!

—কি করলে?

—বারান্দার বৈঠকে শুনলাম আমার সাথে কথা বলেই হ্যাসেট নতুন মাসীর বরকে জেলে দিচ্ছে।

—সে আবার কি?

কনখল বলে যায় নতুন মাসীর মাকে বলা কথা প্রকাশদাকে বলে আসা, পুলিশের জেরায় প্রকাশদার সে কথা ফাঁস করে দেওয়া, পরে হ্যাসেটের জেরায় কনখলের স্বীকারোক্তি, যার ফলে আজ প্যারীবাবুর সাজা হবেই। প্যারীবাবুর যা হবার তা হোক্‌, কিন্তু ও যে নতুন মাসীকে মার পায়ে পড়ে কাঁদতে দেখে এসেছে।

—আমি এ দোষ কেন করলাম রহমৎ।

—তুমি কিছু দোষ করোনি কনা বাবা, কেন থামোথা নিজেকে দোষী মনে করছ?

—নিশ্চয় আমি দোষী। নতুন মাসী—ঐ মুটকী, ওকে আমি দেখতে পারিনে, তাই বলে—

বোলে ঢোক গেলে কনখল। বলে—ও লোক খারাপ নয়। ও আমাকে ভালোবাসে আমিই ওর সর্বনাশ করলাম। আমি কি করে জানব যে আমার ঐ কথায় এইসব হবে।

রহমৎ এইবার কনখলের মন ঘোরাতে চায়। বলে, রাতের কাট্‌লিস্‌ সাজানো আছে। ভাজি দুখানা। উঠে বোসো ত কনা বাবা। ওই মোড়াটায় বোসো।

কাটলেটের কথায় কনখলের শোক কিছুটা কমে। গরম কাটলেট বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খায়, কিন্তু নিজের ব্যবহারে কোথায় যেন অপরাধের কাঁটা গলায় বিঁধে থাকে, স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে না। রহমৎ বলে ঘরে চলো, হুজুরাইন বাস্ত হবেন। সাহেব ইমাম সাহেবের ওখানে গেছেন। হয়ত খবর পেয়ে ডাক্তার সাহেব আর আয়েষা মাই আস্‌বে। বাড়ী চলো।

কেন যেন আয়েষার কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয় কনখলের। আস্‌তে না। যদিও আস্‌বে কিনা জানা নেই। তবুও চলে রহমতের হাত ধরে বাড়ীর দিকে, মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আজ আর কেউ নেই। আস্তাবলের দিকে তাকায়। কাপ্তন পেছনের পা দুটো ঠুকছে। বলে,—রহমৎ, মাকে বলো আমি আস্তাবলে গেছি। আস্‌ব এখুনি। বলে দৌড়ে যায় আস্তাবলের দিকে।

কাপ্তন একা। এ কাঁদন কি যেন হচ্ছে, বোঝে না পঞ্চতিলক ঘোড়া, কিন্তু রোজকার সাথীকে পেয়ে একবার চিঁ হি হি শব্দ করে। হারুণ বসে ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ কনখলের মাথায় বুদ্ধি খেলে। সন্ধ্যা? সেত হয়েইছে। বুক অন্ধকার। ঘর অন্ধকার। বুকের

ভেতর, সে যে অপরাধী, এ কথা কে যেন লিখে দিয়ে যাচ্ছে। হারুণকে হুকুম করে, জিন চড়াও।

কাঞ্চন, বাচ্ছা মনিব, মানে মনিব নয় দোস্ত, কাছে পেয়ে আনন্দে হ্রেষাধ্বনি করে। বাঁদিকে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, চিঁ হিঁ হিঁ। কনখল ওদের কথা বোঝে। জিন কস্‌তেই এক লাফে ঘোড়ায় ওঠে, লাগাম বাঁমুখি টানে। সোজা দরগা। ইমাম সাহেব। আজ কনখল ওস্তাদ সওয়ার নয়, তবুও ঘোড়াই তাকে বাঁচিয়ে ছোটে, শুধু কনখল ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরের ওপর প্রায় শুয়ে পড়ে বলে,—চিনবি ত? শাহজলালের দর্গা। বাবা গেছেন বাইসিকেলে। আগে যাবেন জফর ডাক্তারের টিলায়, তার আগে পৌঁছতে হবে।

কাঞ্চন কনখলের মনের অনুচ্চারিত আদেশগুলো বোঝে। তীরবেগে ঘোড়া ছোটার কথা যারা বইয়ে পড়েছে, তারা বুঝতেও পারবে না তীরতর বেগেও ঘোড়া ছোটে। দর্গার সদরে দীর্ঘদেহ হাজী ওবেদুল্লা সানুচর পায়চারী করেন দেখা যায়। কাঞ্চন ঠিক তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে থামে, কিন্তু কনখল নামে না। যেন জমে গেছে ঘোড়ার পিঠে। ইমাম এগিয়ে এসে বলেন,—এ কে, কনাবাবা? বেহুঁস হয়ে গেছে ঘোড়ার পিঠে? এ ত ঘোড়া নয়, জিব্রাইল। আসাদুল্লা, বাবা কো উতারো।

তার পরের কিছুক্ষণে কিছুই মনে পড়ে না কনখলের। এত লোক কেন, এত আলো কেন, মা বাবা কেন, সবাই এখানে কি করে এল। হাজী ওবেদুল্লা গম্ভীর সুরে হুকুমজারী করেন, যে যার আস্তানায় ফিরে যাও। বাচ্চা আমার কাছে থাকবে রাত্তিরে। নিভাননীকে বলেন, মা বলেছি, কোনো ভয় নেই। বে-ফিকির ফিরে যাও। বাগচিকে বলেন, কুছ্ ডর নেহি।

তারপর কনার আর কিছু মনে পড়ে না। আয়েষাও এসেছিল বাপ মায়ের সাথে, আমল দেননি হাজী সাহেব।

দুঃখের রাত, দুঃস্বপ্নের রাত, সব পোহায়—কিন্তু ভোর কি সব সময়েই মঙ্গলোদয়ে দেখা দেয়? সারা রাত ধরে হাজী সাহেবের কাছে, তার মন বেহাত হয়ে গিয়ে দুষমনি করেছে, এই বোঝাতে চেয়েছে কনখল, ঈশ্বরের প্রতীক হাজী সাহেব শুধু সারারাত জেগে ওর মাথা কোলে করে বসে থেকেছেন, আরবী পারসী উর্দু কি যেন ভাষায় আল্লার নাম করে গেছেন, স্বপ্নের ছায়াছবির মতো টুকরো টুকরো মনে পড়ে ওর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে ও নিজেও জানে না। যখন ঘুম ভাঙে, তখন দেবপ্রতিম ওবেদুল্লার ভোরের আজান দিকে দিগন্তরে ধ্বনিত হচ্ছে। কনখলের মানসে শান্তির প্রলেপ পড়তে থাকে।

১৭

ভোর হতে ঘটনাপরম্পরা দ্রুত লয়ে চলতে থাকে। বাড়ী পৌঁছয় হাজী সাহেবের সাথে, তারপর নিজের নিজের ঘর, মায়ের কোলে, রহমতের পরিচর্যা। বিছানায় শুয়ে শুনতে পায় বাবার সাথে হাজী সাহেবের কথাবার্তা। ওবেদুল্লা বলেন,—তোমার আর এখানে না থাকাই ভালো। বদলীর সময় হয়েছে কি?

—আপনিই ত বলেছিলেন এক বচ্ছর মেয়াদ। প্রায় হয়ে এসেছে।

—তবে দেখাসাক্ষাৎ করে অন্য জায়গায় চলে যাও, তোমার ছেলেকে আমি দোয়া করি, ভালোবাসি। কিন্তু ও ত তৈরী হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের মানুষে। এই ত কটা দিন,

ভালোবাসল, অপরাধ বোধ নিয়ে কষ্ট পেল, পরমপুরুষকেও ভালোবাসল। মন যা চায় সব পেয়ে গেছে, এখন সাধারণ মানুষের বাচ্চার মতো ওকে বাঁচতে দাও। আমি প্রেমধর্মে বিশ্বাসী, কোন আতস দিয়ে কোথায় গিয়ে প্রেমের আলো পড়ল, সে আতসও আমি জানতে চাই না, আলোকোজ্জ্বল, পাত্রও না। আলোটা এলো কোথা থেকে, এইটুকুই সব। এইটুকু যে জেনেছে, সে সব জেনেছে।

—আমি কিন্তু কিচ্ছু বুঝছি না হাজী সাহেব। ঘটনাগুলোর মধ্যে কি আছে যে এত কঠিন তত্ত্বে যেতে হবে?

—আলবৎ যেতে হবে। পাক পরওয়ার দেগার যখন শেষ পর্যন্ত শয়তানকে স্ত্রীলোকের নগ্ন সৌন্দর্য দেখিয়েছিলেন, তখন ইব্‌লিস্ বলেছিল এই নিয়ে আমি বিশ্বজয় করব। সেই ফাঁদ থেকে যদি কেউ বেরিয়ে গিয়ে থাকে তবে তাকে নিয়ে আর কেন খেলা? সে যদি বুঝে থাকে, যে সে ভালোবাসতে চায়, খালি চারদিকে প্রেমপাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিন্তু মুহূর্তে সে নিজের মনে ঝাঁপ দিয়ে প্রেমের উৎস খুঁজে পায়, তারপর নির্ভয়। আর কোনো ভয় নেই। পারতাম ত তোমার ছেলেকে আমি নিজের কাছে রাখতাম। কিন্তু তা হয় না। দুনিয়া বেচাল। তবে, দুনিয়ার যত রং বদল হোক্ না কেন, ওর বেলা আমি নির্ভয়। পাঁকে পড়বে, পাঁক ওকে আটকাবে না, ইব্‌লিসের মায়ায় জড়াবে, কাটিয়ে উঠবে। ও নিজের মনে সত্য প্রেমের উৎসের সন্ধান পেয়ে গেছে। মাকে ডাকো, আমি উঠব।

নিভাননী এসে দাঁড়াতে হাজী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। আশীর্বাদ করে বললেন, খামশ—তক্‌রার করাবার শক্তি যিনি দিয়েছেন, চুপ করে তাঁর কথা শোনো। মনের কবাট ও তালা যিনি বানিয়েছেন, চাবি তাঁর হাতে। লা ই লাহ্ ইল্লিলাহ।

নিভাননী হাঁটু ধরে প্রণতি জানালেন। হৃষীকেশ মাথা নীচু করে। কনখল ঘুমিয়ে থাকে।

সেদিন রবিবার। হাজী সাহেব চলে যাবার পর হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ এবং সর্বাশ্চর্য, বিপিন কার্লাইল আসেন। নিভাননী ভেতরে চলে যাবার সময় বাগচি বলে দেন চা ইত্যাদি পাঠানোর জন্য। নিভাননীর কোনো উৎসাহ নেই, তবু ভদ্রতার ডাকে সাড়া দিতেই হয়। বিদ্যাভূষণ বর্তমান, রহমতের ওপর ভার দেওয়া চলবে না।

হরেন বলেন,—ওহে সাহেব, জামিন হয়ে গেছে। কলকেতা থেকে ব্যারিষ্টার আসবে। খালাস পেলেও পেতে পারে।

—আমি খুশী হব, বলেন বাগচি।

কার্লাইল হাত কচলে বলে, মশাই আমি কি অতো জানি। যা শুনলুম, ওপর ওপর মনে হোলো এ গীতা সোসাইটির পুজোর বাজারের ওপর রাগ ছাড়া আর কিছু নয়, আর পুলিশ সাহেবের ওখানে প্যারীবাবুর সাথে দেখা হলেও উনিও ঐরকমই ঘটনা, তাই জানালেন। এখন শুনতে পাচ্ছি প্রকাশের দল আমার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে। অবিশ্যি পুলিশ সাহেব আমার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা করবেন, তবুও হাকিমহুকুমের মহলেও কথাটা জানাজানি হয়ে থাকা ভালো।

হরেন খেপতে থাকে, বলে আবার সাক্ষী তৈরীর চেষ্টা হচ্ছে মশাই। আপনাকে আমরা চিনিই না, আপনি কোনদিনই আমাদের এখানে আসেন নি। আচ্ছা ছ্যাঁচড়া লোক ত আপনি।

—হেঁ হেঁ, আপনাদের উকীলদের মুখের বাঁধন নেই জানি, মনে যা ভাবেন, বলেন অন্য রকম।

—হোপ্‌লেস্‌, বলে হরেন চেয়ারে পিঠ ঢালেন।

বিদ্যাভূষণ তামাক সাজা এবং খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো শক্তি ব্যয় করেন না। কিন্তু আজ বাগচি একেবারে চুপ। হাঁ, না কিছুই বলেন না। চিন্তিত মুখে বসে থাকেন। ভাবেন এরা উঠ্‌বে কখন।

ওদিকে বুড়া রহমৎ কনখলের ঘরে বসে। কনখল, ঘুম নয়, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে রহমতের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, রহমৎ, নতুন মাসীর কাছে যাব।

রহমৎ সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকায়। হুজ্‌রাইন রান্নাঘরে সাহেবরা বারান্দায়। আস্তে গোসলখানার দরজা খুলে বলে, 'এসো'।

প্যারীবাবু জামিনে খালাস হয়ে মহালে গেছেন টাকার তদ্বিরে। অতবড়ো বাড়ী, খাঁ খাঁ করছে। জীবন খেলার মাঠে গেছে, তখনো ফেরেনি। বাড়ীর একমাত্র ঝি সদরে বসে। রহমৎ আর কনখলকে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বলে মাকে খবর দেব? রহমৎ বলে, না, খবর দেবার দরকার নেই। কনাবাবা মার কাছে যাবে।

সেই শোবার ঘর, যেখানে একদিন ঊষা কনখলকে বুকের তলায় পিষে ফেলতে চেয়েছিল। আজ উপুড় হয়ে সেই বিছানায় নিজের বুক পিষে ফেলছে। কনখল গিয়ে পিঠে হাত দিয়ে বলে—নতুন মাসী।

তড়িতাহতার মতো বিদ্যুৎবেগে উঠে বসে ঊষা। কিন্তু নিস্পন্দ, নিষ্প্রাণ প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিতা হয়ে যায়। কনখল বলে, মাসী।

ঊষা হঠাৎ উঠে নিজের গায়ের কাপড় সামাল করে। কনখলকে কোলে নিয়ে বসে। বলে, বাবা?

এ কে? মা, আয়েষা, নতুন মাসী, সবাই মা? কনখল কি বলতে এসেছিল ভুলে যায়। শুধু ঊষার সুপুষ্ট স্তনদ্বয়ের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। ঊষা ওর পিঠে হাত বুলোয়। বলে, যা হবার হবে বাবা, তুই কেন ভাব্‌ছিস।

কনখল অনেক কথা বলতে চায় কিন্তু একটিও বলা হয় না। ঊষা শুধু বলে, চুপ করে থাক, তোর কথা আমি শুনতে চাই না, জানিস রে, তোকে আমি—

—ভালোবাসো? জানি বলেই ত বলতে এসেছি তোমার কাছে আমি অপরাধী। তুমি মাকে কি বলেছিলে আগুন লাগার রাতে, সেইকথা আমি কিছু না বুঝে অনেক জায়গায় বলে ফেলেছি। তাইতেই বুঝি সর্বনাশ হচ্ছে। মাসী, আমাকে শাস্তি দাও। আমার একটি কথায় তোমার এত কষ্ট হোলো।

ঊষা বিছানা ছেড়ে মাটিতে দাঁড়ায়। কনখলকে শুইয়ে দেয় বালিশে মাথা দিয়ে। তারপর বলে, দিচ্ছি শাস্তি।

পরের আধঘণ্টার কথা কনখলের মনে থাকে না। স্বর্গে যাওয়া, অন্ধকারে ডুব দেওয়া, আবার সাঁতরে আলোয় ওঠা, এই সব ধরনের কি যেন হয়ে যায়। জ্ঞান ফেরে যখন, তখন ঊষা ওর হাত ধরে টেনে বলে, চল্‌ দিদির কাছে।

ঊষার হাত ধরে মায়ের কাছে যাওয়া। নিভাননী হকচকিয়ে যান। রাত হয়ে গেছে। ঊষা গিয়ে বলে, দিদি,

—কি রে

—কনা মনে করছে ও আমার খুব অনিষ্ট করেছে। সেই গুদামে পাট না থাকার কথাটা সাহেব সুবোকে বলে। ও ঘুমোতে পারে না, সারারাত কাঁদে, ওকে কি করে বুঝোব ও কিছু অন্যায় করেনি? তুমি ওকে বোঝাও, আমার কপালে যা আছে তা হবে, কিন্তু ও মনে মনে নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে কষ্ট পাবে, এ আমি কি করে দেখব,—

নিভাননী সসম্ভ্রমে তাকান ঊষার দিকে। ছলাকলা-লাস্যময়ী যুবতী যেন হঠাৎ জগন্মাতার রূপ নিয়েছে। কি প্রশান্তি দুটি চোখের চাহনীতে।

হাত ধরে বসান ঊষাকে। কনখলকে একটু কড়া করেই ঘরে যেতে বলেন। মানে ছিল। কনখলের বিছানায় আয়েষা এসে শুয়ে আছে। সেটা আগে বলেন না। কনখল নিজের বিছানায় গিয়ে ঝাঁপ দেয়। তারপর কোন অতলে তলিয়ে যায় টেরও পায় না।

ঘণ্টি বাজিয়ে রহমৎ খানা তৈয়ার জানায়। বাগ্‌চি, জাফর, কুলসম, নিভা, আয়েষা, কংখ্‌ টেবিলে বসে। ঊষা পাশে একটা চেয়ারে বসে থাকে। মুসলমানের রান্না ও খাবে না, শিলেট গোঁড়া হিন্দুর রাজত্ব। হঠাৎ বাইরে হরেনবাবুর গলা শোনা যায়—বৌদি, আজ আমি জাত খোয়াব। ডিনার টেবিলে আমার একখানা চেয়ার।

সবে সুপ দেয়া হয়েছে। নিভাননী নিজে উঠে গোলকামরা থেকে চেয়ার নিয়ে আসেন। বলেন, বসুন ঠাকুর পো।

রহমৎ ওস্তাদ বান্দা। আর একটি সুপের ডোঙা, মায় কাঁটাচামচ এর মধ্যেই সাজিয়ে ফেলেছে। ডামাস্ক কাপড়ের ন্যাপকিন শুভ্র ফুলের মতো করে বাঁ দিকের কোয়ার্টার প্লেটে। বাগচি হেসে বলেন, জানতাম।

জ্বলে ওঠে হরেন। কি জানতে হে সাহেব? তুমি আমি জীবনটাকে ইন্ধন করে চলেছি। কিন্তু প্রাণের বিকাশের কোনো আমল দিয়েছি? আমাকে গীতা সোসাইটির স্বামীজি ডেকেছিলেন। জিজ্ঞেস করছিলেন কনখলের কথা। ইমাম সাহেবের কথা। যখন সব কথা শেষ হোলো, বললেন বসুন্ধরা চিরকালই বীরভোগ্যা থাকবে, মিথ্যা ঠিক কুয়াসার মতো কেটে যাবেই, আর আচার অনাচার বিভেদ মিটে যাবে। বাড়ীতে গেলাম। আমি তোমার এখানে আসি, যেখানে মুসলমানী আয়েষা বৌদির সাথে রান্নাঘরে বসে, এখানকার খাবার খাই—আমার স্ত্রী পার্শ্ববর্তী অপরা তিন গিন্নীর সাথে তারই ফলাও আলোচনায় লিপ্তা ছিলেন। আমি যেতেই যে সব ভাষা উচ্চারণ করলেন, সেগুলো সাধু তো নয়ই, অসাধু বলেও তার কৌৎসিত্য বোঝাতে পারবো না। অর্থাৎ

—থামো হে, সুপটা খাও।

হরেনবাবু বললেন, খাচ্চি। কিন্তু আদব কায়দা জানিনে। বলে সুপপ্লেট দুহাতে ধরে দুধের বাটির মতো চুমুকে সবটা সুপ খেয়ে নিলেন। সমস্ত ডিনার টেবিল হাসিতে ফেটে পড়লো। রহমৎ যে তৈরী খানসামা, তারও সাদা দাড়ীর ফাঁকে ঈষৎ হাসির রেখা। দৌড়ে এসে প্লেট সরিয়ে হরেনবাবুর বাঁ দিকে চিকেন কাট্‌লেটের ডোঙা স্থাপন করল, হরেনবাবু ভ্রূক্ষেপ না করে খপ্‌ করে ডান হাত দিয়ে চারটে কাট্‌লেট তুলে নিজের প্লেটে রাখলেন এবং আর কারুকে দেবার আগে কচ্‌মচ্‌ করে সেগুলো খেয়ে ফেললেন।

আয়েষা উঠে এসে বলে, কাকাবাবু আপনি আমাদের সাথে এক টেবিলে খাচ্ছেন, একথা জানাজানি হবে,

—তুই থাম তো—রহমৎ আর কি আছে?

নিভাননী হেসে বলেন, ঠাকুর পো, এর পর রোষ্ট আছে,—খাসীর মাংসের। তারপর

ঘি-ভাত আর মুর্গীর কারি, শেষ পুডিং। জানিয়ে রাখছি এইজন্যে যে যেটা যতটা খাবেন কোনো অভাব হবে না। যা ভালো লাগে পেট ভরে খান।

হরেন এবার নিজের গোঁফ্ মুছে বলেন,—তা ত খাবই। তবে, বোধ হয় আপনাদের অংশে কিছু কম-ই পড়ে যাচ্ছে—

—একেবারেই না। আজ জাফরেরা এখানে খাবে, সব জিনিসই প্রচুর পরিমাণে করা হয়েছে। আর দেখুন না, এই হতভাগিনীটাকে, বলে ঊষার দিকে আঙুল দেখান নিভাননী। ও একসঙ্গে বসবে না। কিন্তু দেখুন, ভাতকারী নিয়ে কেমন মেঝেতে বসে গেছে। বেচারা শোকতাপ পাওয়া মানুষ—

কনখল আর আয়েষা হাত টেপাটেপি করছে। হঠাৎ দু'জনাই উঠে বলল, আমাদের পেট ভরে গেছে মা রোস্ট খেয়ে। আমরা উঠ্‌ব?

নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকান সভয়ে—অভব্যতা করছে ছেলে। কিন্তু না। হৃষীকেশ বলেন, ঠিক্ আছে। টেবিল বড়োদের ছেড়ে ছোটোরা উঠে যাক।

নিভাননী বলেন, রহমৎ, দু গ্লাস দুধ দিয়ে এসো কনার ঘরে। যা তোরা। আর দেখিস্, যেন ঝগড়াঝাঁটি করে জ্বালাস নে। হরেনকে বলেন,—ঠাকুর পো, আর একটু ভাত কারী?

হরেন বলেন,—আজ দীক্ষা হোলো। যতো দেবেন খেয়ে যাব। কিন্তু ভাবতেও ভয় হচ্ছে বাড়ীতে সমাদরের বহরটা কি প্রকার হবে।

বাগচি বলেন,—খেয়ে দেয়ে একটু বাইরে বসি চলো। ইতিমধ্যে, বলে নিভাননীর দিকে ইঙ্গিত করেন।

নিভাননী ঊষার হাত ধরে বলেন, বাড়ী যাবি চল্। ঊষা বাড়ীতে ঢুক্‌লে জীবনকে ডাকেন। বলেন,—বাবা, আমায় একটু হরেনবাবু উকীলের বাসা থেকে ঘুরিয়ে আনবি?

জীবন সাত তাড়াতাড়ি তৈয়ারী। চলুন মাসীমা।

রাত হয়ত সাড়ে আটটা ন'টা। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় যে গৌরাঙ্গী বসে আছেন তিনিই হরেনের স্ত্রী বুঝতে দেরী হয় না। একেবারে একা। প্রতিবেশিনীরা কেউ নেই। নিভাননী গিয়ে সামনে বসেন। বলেন, ভাই, ভয় পাবেন না। আমি কনখলের মা। একটু আলাপ করতে এলাম। অবসর আছেন ত?

হরেনবাবুর স্ত্রীর নাম নির্মলা। তিনি উঠে এসে নিভাননীর দুহাত ধরেন। বলেন, আজ আমার কি ভাগ্য। অবসর কেন থাকবে না দিদি। কোলেও কেউ আসেনি, আত্মীয়-স্বজনও নেই। সময়ে অসময়ে এবাড়ী ওবাড়ীর গিন্নীবান্নিরা এসে আসর জাঁকান, কিন্তু এত রাত্রে যে দিদি? সঙ্গে—

ও বাড়ীর জীবন। বাইরে বসে আছে। আমি কিন্তু আপনি ছেড়ে তুমিতে নাম্‌ব। আমাদের কর্তারা তাই করেছেন। শোনো বৌ, তোমার বর আজ আমার ওখানে রাত্রে খাবেন। 'খেয়েছেন' বলে উঠ্‌তে পারেন না নিভাননী। বলেন,—আমার ঠাকুর আছে, আমিও বামুনের মেয়ে। বাইরের ঠাটঠমকে ভুল বুঝো না। জানো না বোধ হয়, বিদ্যাভূষণ ম'শায় রোজ বিকেলে চা জলখাবার খান।

—কিন্তু দিদি, ঐ যে শুনি, পুলিশডাক্তার আর তার মেয়ে ওখানে—

—ও আয়েষা? হ্যাঁ সে আসে, কিন্তু সেত হেঁসেলে ঢোকে না। এর আগে পোলো ময়দানের টিলার বাসার পাশাপাশি ছিলাম। ঐ মেয়ে আমার ছেলের বন্ধু, তাই না এসে

থাকতে পারে না। আর মেয়েও রত্ন। কোনোদিন আমার হিঁদুয়ানীতে চোখ দেয় নি। আমি নাড়ুগোপালের মাথায় জল দি, তুলসী তলায় প্রণাম করি, ও মেনে নিয়েছে এগুলো করতে হয়। জন্ম ওর মুসলমানের ঘরে, কিন্তু মেয়ে লক্ষ্মী।

নির্মলা একটু চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন,—দিদি, মনে বড়ো অশান্তি।

নিভাননী একেবারে বুকে টেনে নেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন,—ঠাকুরপোকে বকাঝকি করবে না, দেখবে শান্তি আসবে। বিধাতার রাজ্যে অশান্তি নেই, মানুষ নিজের মন থেকে সৃষ্টি করে কষ্ট পায়। পারবে?

এমন একটা জায়গায় ঘা দিয়ে নিভাননী কথাগুলো বলেন, নির্মলার দুচোখ ভেসে যায়। নিভাননী আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দেন। কিচ্ছু বলেন না।

পুলিশ ফাঁড়ির পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজে। বাইরের ঘরে হরেনের গলার শব্দ শোনা যায়।—এ কি জীবন? একা বসে? —কি, কি,—তাই নাকি? আচ্ছা কাণ্ড যা হোক্। বৌদি, কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎ—

—উঠ্‌ছি ঠাকুরপো। নিজে ত গিয়ে রোজ বিকেলে আড্ডা জমান। আমার বোনটিকে একদিনও আনতে পেরে ওঠেননি এ পর্যন্ত। তাই এলাম। এখন থেকে রোজ ও যাবে। নিয়ে যাবেন কিন্তু। বলে নিভাননী ওঠেন।—কই বাবা জীবন, চলো, রাত হয়ে গেছে।

হরেন দম্পতীর সে রাত বিনা কলহে কাটে। নিভাননীর দৌত্যে মঙ্গলস্পর্শ ছিল।

ফেরবার পথে ঊষাকে দেখে যান নিভাননী। ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথায় হাত দিয়ে প্রার্থনা করে যান অভাগীকে ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষণের জন্য। বাড়ীতে গিয়ে দেখেন জাফর কুলসম আয়েষা চলে গেছে। হৃষীকেশ চুরোট মুখে একা বারান্দায় বসে। কনখল ঘুমিয়েছে। স্বামীর পায়ের কাছে বসে পড়েন নিভাননী। বাগচি তাঁর মাথার চুলে হাত বুলোন।

১৮

ইমাম সাহেবের উপদেশ মতো বাগচি তদ্বির করে বদলীর চেষ্টা করেছেন। সামনে পুজোর ছুটি। ছুটির পরে ফেঞ্চুগঞ্জ বলে এক বন্দরে পরীক্ষামূলক মহকুমার হাকিম হয়ে যেতে হবে। পুজোয় দেশে যাবেন, তোড়জোড় চলছে। লেফ্‌টেনাণ্ট আব্বাস বলে ছোকরা ডাক্তার মিলিটারিতে এসেছে, আয়েষার বিয়ের সম্বন্ধ তার সাথে পাকাপাকি। বিয়ের কথা ওঠার পর থেকে আয়েষা ঘরকুনো হয়ে গেছে, আদৌ বাড়ীর বাহির হয় না। কনখল আব্বাসকে দেখেছে। যেমন শিকারে, তেমনি পোলোতে। আর একেবারে সাহেবদের মতো দেখতে, টক টক করছে গায়ের রং। কনখলের পরিচয় পেয়েছে আয়েষার বাবার কাছে। আয়েষাকে বিয়ে করবে বলেই বোধহয় আয়েষার খেলার সাথীকে একটু ভালোও বেসেছে।

বাড়ীর পাহারা হারুণকে রেখে, দিন দেখে, বাগচি নিভাননী কনখল রহমৎ দেশমুখী রওনা হন। আবার সুরমা, করিমগঞ্জ, চাঁদপুর। চাঁদপুর থেকে বিরাট বড়ো চাটগাঁ মেল জাহাজে ওঠেন সবাই। জিনিসপত্র গোছগাছ করে কুলী মিটিয়ে ডেকে গিয়ে বসেন হৃষীকেশ। কেবিনের সাথে বাথরুম, কনখলকে মুখ হাত ধুইয়ে ঠিকঠাক করে রহমতের জিম্মা করে দেন নিভাননী। নিজে গিয়ে ডেকে বসেন। রহমতের হাত ধরে লাফাতে লাফাতে কনখল বলে,—চলো শিগগির, ইঞ্জীন দেখব।

দুটো বিরাট ডাণ্ডা ওঠাপড়া করছে। কতকগুলো চাকা ঘুরছে। বাষ্পাচ্ছন্ন এঞ্জিনের ভেতর। হঠাৎ ঘাঁই ঘাঁই করে ঘণ্টি বেজে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে কী গম্ভীর সুরে ভোঁ আওয়াজ। কনখলের বুক যেন ভরে উঠলো। মেল জাহাজ হৃৎস্পন্দন তুলে তীর থেকে সরে যায়, তারপর মোড় ঘোরে, মেঘনার কালো জল কেটে পদ্মার গেরুয়া তরঙ্গসঙ্কুল রওনা দেয়। কনখলের বুক উল্লাসে ভরে ওঠে। একটা অসীম শক্তির পরিচয় পায় ঐ জাহাজের গতি বেগে।

জাহাজের পেছনের ডেকে ঘুরে বেড়ায়। বিছানা পেতে মাথার কাছে তোরঙ্গ রেখে কতো মানুষ সংসার সাজিয়ে বসেছে। আবার একটা চায়ের দোকান, চা বিস্কুট বিক্রী হচ্ছে। চোখ বুলিয়ে যায় কনখল। নীচের তলায় কি পরিমাণ মালপত্র, তারও আনাচ কানাচে লোক। একটা পাশের কামরা থেকে অতিপরিচিত সুগন্ধ আসে, কনখল রহমতের হাত টেপে, রহমত হেসে বলে,—বাবুর্চিখানা।

জাহাজের অন্ধিসন্ধি সরেজমিন করে হাঁপ ছাড়ে কনখল। ওপরকার সামনের ডেকে বেতের চেয়ারে বাবা মা বসে, ও গিয়ে পাশে বসে। জল কেটে জাহাজ চলেছে। এঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ, আর পেছনে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। দুটো একটা নৌকো বেকায়দায় সেই ঢেউয়ে পড়ে নাস্তানাবুদ হচ্ছে। কিন্তু সাবাস মাঝি। কি কায়দায় দোলানি খেয়েও নিরাপদ জায়গায় চলে যাচ্ছে। গাং চীলগুলো নদীর দুপারে চক্রাকারে উড়ছে, আর মাঝে মাঝে মরশুমী হাঁসের ঝাঁক সাঁ সাঁ করে উড়ে যাচ্ছে। কনখল পিট পিট করে তাকায়, আর কেবিনের বন্দুক দুটোর কথা ভাবে। কি মনে হয় ওই জানে, হঠাৎ ফিক্ করে হেসে ফেলে। বিশ্বস্ত রহমৎ হাঁটু মুড়ে এক পাশে বসে। আস্তে উঠে এসে রহমতের পাশে বসে কানে কানে কথা কয়। রহমৎ ঠোঁটে আঙুল লাগিয়ে বলে,—জাহাজে ফায়ার করা বারণ, কোম্পানীর আইন। তবে যদি কোন বন্দরে জাহাজ দাঁড়ায় তখন হতে পারে। চুপ করে থাকো, আমি সাহেবকে বলব।

দুসার কেবিনের মাঝখানে বসবার আর খাবার ঘর। কি সুন্দর করে সাজানো। জাহাজের খানসামা এসে বলে,—হাজিরা তৈয়ার। বাবা মা ওঠেন। মা খানসামাকে বলেন, রহমৎ আমার বাবুর্চি। ওর জন্যেও নাস্তা,—

—সে সব ঠিক আছে মেমসাব।

কী অপূর্ব রান্না। দুটো ডিম চট করে খেয়ে নেয়। তারপর, ডোঙার ঢাকনা খুলতে সুঘ্রাণে ঘর ভরে যায়। মাছ সেদ্ধ। ইলিশ মাছ। ওর পাতে পড়তেই খেয়ে দেখে একটিও কাঁটা নেই। কি কায়দায় কাঁটা ছাড়ালো ওরা, ভাবে। আর ঠিক সেদ্ধও নয়, একটু পোড়াটে গন্ধ, তাতেই যেন বেশী ভালো লাগে। কিন্তু কি জ্বালাতন! খাবার জিনিস খেলেই পেট যে কেন ভরে যায়। জল খেয়ে চুপচাপ বসে, কিন্তু জানে, মা এখনি চিঁড়ে ভেজা, না কি দিয়ে এক মগ দুধ খেতে বসবেন। পরিজ না ছাই। অখাদ্য। কিন্তু আইন অমান্য করা শেখেনি বলে তাও খেতে হয়। মুখ মুছে উঠে যায় রহমতের সন্ধানে জাহাজের বাবুর্চিখানায়। পেতলের ঝকঝকে রেলিং ধরে নীচে নামে। নামতেই যে দৃশ্য ওর চোখে পড়ে তাতে আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। জাহাজ মাঝ গাং ছেড়ে দিয়ে তীর ঘেঁসে চলেছে। আর দোতলা সমান নদীর পাড় ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে নদীর জলে। খুব সোরগোল উঠছে ডাঙা থেকে। লোকে ঘরবাড়ী জিনিসপত্র সরাচ্ছে। তাকিয়ে দেখে নদীর জল গেরুয়া। স্রোত খরধার। রহমৎ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, লক্ষ্য করেনি। রহমৎ বলে,—পদ্মা।

পদ্মা? কনখলের দুইচোখ বিস্ফারিত হয় অবাক বিস্ময়ে। এই পদ্মা? ভয়াল, মনোহর, প্রাণঘাতিনী, কলকল্লোলিনাদিনী, তটবিপ্লাবিনী, সংহারিনী, একি ভীষণা মূর্তি এই নদীর। ও পড়েছে কি যেন বইয়ে, কীর্তিনাশা বলা হয় এই নদীকে, বহু প্রতিষ্ঠাবান লোকের কীর্তিনাশ করেছে। কেউ কেউ কর্মনাশাও লেখে। ছুটে আসে মায়ের কাছে। বলে,—মাগো, এই নদী—

—হ্যাঁ—এই নদী পদ্মা। বোস্ ত আমার কোলে। হ্যাঁরে কনা, বেড়ে উঠ্‌লি ত এগারো বারো হয়ে, জীবনে নিজেদের আত্মীয়স্বজন কাউকে দেখিস্‌নি। গ্রামে যাচ্ছিস্, সেখানে সবাই গরীব, সবাই নবাব। কিন্তু সাহেব নেই। কি করে সেখানে থাকবি?

—বাবা আর তুমি যে ভাবে থাকবে। স্থিরকণ্ঠে বলে কনখল।

—ঐ দ্যাখ্, পদ্মার ভাঙনে গ্রাম গেছে, দেশ গেছে, একটা গাছ, কোনোরকমে মাথা তুলে আছে। তাতে কতলোক, মুরগী ছাগল সাপ সব উঠে বসে আছে। কেউ কারো কোনো অনিষ্ট করছে না। কি করে হয়?

কনখল ধ্যানমগ্ন হয়ে এক মিনিট ভাবে। বলে, হবে না কেন? সবায়ের শত্রু ঐ নদী—নদী থেকে ওরা নিজেকে বাঁচাচ্ছে। আর কেন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করবে!

নিভাননী উৎফুল্লে উপ্‌ছে পড়তে পারতেন, কিন্তু সামলান নিজেকে। গম্ভীর সুরে বলেন,

—গোয়ালন্দ এসে গেল। এইবার বাড়ীর লাইন। ষ্টীমার বদল করতে হবে।

গোয়ালন্দ ভারী ষ্টেশন। ঢাকা মেল, চাটগাঁ মেল আরো কতো গাড়ীর আড়ৎ। চাটগাঁর ডাক জাহাজ থামতে সেকি কোলাহল। কাঠের সিঁড়ি পেতে লোহার চেন দিয়ে বেঁধে দেবার সাথে সাথে হাজারো কুলীর আক্রমণ। রহমৎ—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও বলে একে ওকে ধেঁদিয়ে, তিনকুলীর মাল নিয়ে নীচে নামল। নিভাননী হৃষীকেশের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে বললেন,—এইবার?

—চলো। দেখাচ্ছি।

কালীগঞ্জ সার্ভিস ষ্টীমারের আরোহী হয়ে কনখল ষোলোবোরের বন্দুকটা হস্তগত করেছে। বাবার হাফ্‌ল্যাডস্টোন ব্যাগে কার্তুজ ছিল, চারটে চার নম্বর নিয়েছে। রহমৎকে গা টিপে জানিয়ে দিয়েছে অপরাধের কথা। জাহাজ ছাড়তে দু ঘণ্টা দেরী।

নতুন জাহাজে হৃষীকেশ নিভাননী খোলস বদলাচ্ছেন। হৃষীকেশ ইজের কোর্তা ছেড়ে খালি গায়ে ধুতি পরেছেন। খালি পা নিভাননী লাল কস্তাপেড়ে পরে গৃহলক্ষ্মী সেজে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু রহমৎ ও কনখল যে সাতটা ঘুঘু কবুতর আর সারস মেরে এসেছে, সেটা লক্ষ্য করেননি। রহমৎ বুড়ো ওস্তাদ। বলে,—বাবা, গাঁও এসে গেছে, জাহাজ ছাড়লেই পৌঁছব। শিকার কটা,

—বুঝেছি। গাঁয়ে বুঝি আমরা অন্যরকম হয়ে যাব? তাহলে,

—আমি বলিকি বাবুর্চিখানায় দিয়ে আসি। সন্ধে নাগাদ গাঁয়ে পৌঁছব। তার আগে দুপুরের খানায় যদি ওরা করে দেয়,

—বেশ ত, দাও না। কিন্তু মাকে আমি বলবই। রহমৎ বিব্রত বোধ করে। কনখল গিয়ে নিভাননীর কোলে মুখ গুঁজে সব বলে। নিভাননী ছেলের দুঃসাহসে উতলা হন কিন্তু খুশীও হন। বলেন,—ঠিক আছে। সামলে নিচ্ছি।

ঐ একটি কথা। সামলে নিচ্ছি। না বলে নিভাননী যদি সেদিন শাস্তি দিতেন, হয়তো

কনখলের ভবিষ্যৎ রূপান্তর গ্রহণ করতো।

খাবার টেবিলে বিচিত্র পক্ষীমাংসের সমাবেশে হৃষীকেশ পুলকিত হন। বলেন,—আমাদের কালীগঞ্জ সার্ভিস লাইন রীতিমতো উন্নত। কেউ কিছু ভাঙেনা, তবে কনখল উস্‌খুস্ করে। মিথ্যে সহ্য করতে পারে না তাই। ছাগলছানার মতো মায়ের বুকে ঢু মারে। নিভাননী হেসে ফেলে বলেন,—এসব ইস্টীমারের নয়, তোমার ছেলের শিকার। বোকো না, কথা দিয়েছি।

হৃষীকেশ কয়েক মিনিট গুম্ হয়ে থাকেন। বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে সারসের রোস্টএর ঠ্যাং চেপে ডান হাতে ছুরী চালান। মুখে মাংসের পিণ্ড ঠেলে দিয়ে বলেন,

—কার্তুজ পেল কোথায়?

—কেন, খোলা প্ল্যাডস্টোন ব্যাগে।

—হুঁ। আচ্ছা হাতের তাক ত! সতেরোটা পাখী মারল চার কার্তুজে। কিন্তু এইবার গোলাবারুদ সামাল করো নিভু। বন্দুকেও শিকলি পরাও। আজ সাত বছর পরে গাঁয়ে ফিরছি। মা আছেন, দুই বৌদি আছেন, প্রচুর আত্মীয় বন্ধু আছেন, তাদের সাথে এক হয়ে একমাস থাকব—এতে যেন বাধা না হয়।

—কোনো বাধা হবে না। কনাকে আমি আগলে রাখবো।

কালীগঞ্জের ষ্টীমার ছাড়বার ভোঁ দিলো। সিঁড়ির পাটাতন সরে গেলো। তর তর করে জাহাজ পদ্মা ছেড়ে যমুনার দিকে মোড় নিলো। সিরাজগঞ্জ লাইন। পথে পড়বে, আরিচা, নগরবাড়ী, নতুন ভারেণ্ডা বিনানই। শেষোক্ত ষ্টেশন বাগ্‌চিপরিবারের গন্তব্য স্থান। ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার, তবুও হৃষীকেশ গ্রাম্য হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছেন। জুতো মোজা কোট পাংলুন ট্রাঙ্কে উঠে গেছে। একটি ছাতা, খালি পা, ধুতি, গেঞ্জি, দাঁড়িয়ে আছেন ডেকে। নিভাননী ঘোমটা টেনে কলাবতী হয়ে বসেছেন। কনখল দেখছে, আর অবাক হচ্ছে।

আরিচা গেল, নগরবাড়ী গেল। এইবার। বাগচি অসম্ভব অধীর হয়ে উঠেছেন, ষ্টেশন দেখা দিতেই স্ত্রী ছেলের হাত ধরে সামনের ডেকে টেনে নিয়ে বলেন—এই আমাদের দেশ। ভালো করে দেখো।

দেশের মাটিতে ষ্টীমার ভিড়ল। কি বিরাট নদী, আর কি ঘূর্ণী জায়গায় জায়গায়। কে একজন যেন একদলা কাগজের মোড়ক ছুঁড়ে দিল ঘূর্ণীর বুকে, অতলে তলিয়ে গেল মুহূর্তে।

শুধু মা বাবার চেহারাতেও রূপান্তর নয়, রহমৎও উর্দী ছেড়ে কখন ধুতি সার্ট পরেছে দেখে কনখল। ভাবে নিজেও তবে তাই করবে নাকি। নিভাননী ধুতি পিরান বার করেই রেখেছেন। ওর ত অভ্যাস আছেই। কাপড় ছাড়তে দেরী হয় না।

সিঁড়ি পাততেই যে ভদ্রলোক এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলেন, তাঁর পরনে ধুতি, কিন্তু গায়ে সার্টের ওপর খাকী কোট। কনখল দেখে অবাক হয়, সার্ট কোট বাবা যেমন পরেন তেমনি। কলকাতার সাহেব বাড়ীর। বাবা বলেন, শিবুদা। ওরে প্রণাম কর। নিভাননী হাঁটু গেড়ে বসে ঝাড়া দু মিনিট প্রণাম করেন। কনখল ঝট্ করে দুপায়ের পাতা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক বলেন, চলো, নামি। আয়রে কনখল, আমার হাত ধর। ভালো লাগে কনখলের, কেমন যেন উদার খোলা মাঠের স্পর্শ তাঁর হাতে।

সবাই নামেন, ছোট্ট ডিঙ্গীতে চড়ে বসেন, ডাকাতে চেহারার গহর মাঝি নৌকা চালাবে, আগে মালপত্র শিজিল করে নিচ্ছে। একটা ছোট্ট ছেলে, পুঁচকে, বছর ছয়েকের হবে, বসে

হালের কাণ মোচড়াচ্ছে। মাঝি বলে, ছারান দে, ভাঙা যাবে। ছেলেটা হঠাৎ ভয় পেয়ে যায় যেন। হাতের কসরৎ থেমে যায়। গহর বলে, রায়বাহাদুর, ছারব? সেই ভদ্রলোক মাথা নেড়ে সম্মতি জানান। কিন্তু জিজ্ঞেস করেন,—জোলায় সোঁত আছে ত? গহর বলে, সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত টানা জল। কোনো ফিকির নেই।

কনখল শুনতে পায়, বাবা ঐ শিবুবাবুর কানে কানে বলছেন,—দাদা, এটা গহর ডাকাত না? উনি হেসে মাথা নাড়েন। মার যে কি হয়েছে, বুক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে লজ্জাবতী হয়ে বসে আছেন। ডিঙি তরতর করে চলেছে যাকে বলছে জোলা, সেই নালা দিয়ে। সরু, যেন হাত বাড়ালেই দুপার ধরা যায়। কত ঝিয়ারীরা চানে নেমেছে, কত বউ কলস ভরে, সর্বাঙ্গে তরঙ্গ উথ্‌লে ঘরকে চলেছে। কত কলির কানাই আনাচে কানাচে উঁকিঝুঁকি মারছে। ডিঙি চলেছে।

বাবা হঠাৎ গহরের হাত ধরে প্রায় বুকে টেনে বলেন, গহর দা, চিনতে পারো?

পারবো না ক্যান—রিসি—গাব চুরী কর‍্যা খাওয়ার ওস্তাদ। শুন্‌ল্যাম নাকি হাকিম হছিস্, তাই ভয়ে কথা কই নাই।

—ওডা কে? ওই ছ্যারাটা?

—আর কও ক্যান। কি বিপদেই পরল্যাম ডাকাতি করব্যার গিয়া। মরিয়ম, ঐ যে সাজাদ দারোগার বহেন,—লুট্যা ত আনল্যাম। নিকাও হোলো। ফল ঐ চ্যাংড়া। মরিয়ম মর‍্যা গিছে। গহরের দুচোখ টস্‌টসে জলে ভরে এলো।

ঐ যে রায়বাহাদুর শিবুদা, উনি বললেন, থাম্ তুই গহর। শোনো রিসু, ওর বউ ত মরলো, ঐ একটি ছেলে রেখে। ডাকাতি ছাড়ল। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুক নিয়ে আমাকে গিয়ে বলল, আমাক শাস্তি দ্যাও রায়বাহাদুর। আমি মাইনষের ভালোই করব, আর ডাকাতি করব না। ফলে ওর বিরুদ্ধে যা কিছু চার্জ ছিল, নাকচ করে দিয়ে ওকে গাঁইয়া করে নিয়েছি। ভালো করিনি? কি বলিস্ রিসু?

বাবা বলছেন, দাদা, আপনি কোন দিন কোন কাজ খারাপ করেছেন, একথা কেউ বলবে না। তবে গহরকে একলা পেলে আমি জেল দিতাম।

গহর দাঁড় ছেড়ে রুখে দাঁড়ায়। কি বিশাল বুক, এক মুখ দাড়ি। দুটো হাত যেন চাটগাঁ মেলের দুটো ইস্পাতের রানার। ছাপ্পান্নো ইঞ্চি বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। গহর বলে, আস্যা গ্যালাম রায়বাহাদুর। রিসুকে কয়্যা দিবেন, গহর কোনোদিন মন্দ কাজ করে নাই।

মন্দ কাজ? কাকে মন্দ কাজ বলা হয়, কনা জানে না। মন্দ? সে কেমন কাজ? যা ভালো লাগে, তাই যদি মন্দ কেউ বলে, তবে, যারা বলে, তারাই মন্দ। নিভাননী কেন যে ভূতের মতো ঘোমটা ঢেকে বসে আছেন। কনখলের বিস্মিত সত্তা উত্তর চায়, উত্তর চায়।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১০। ইয়োরোপ : পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিন (১৮৪২-১৯২১)

১৮৮৯ সালে ক্রপটকিন যখন লণ্ডনে জনসভায় ভাষণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন তখন জনৈক সাংবাদিক তাঁকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন : 'যদিও তাঁর বয়স বাড়ছে তথাপি তাঁর বপু ও বচন থেকে ঝরে পড়ছে অনির্বান যৌবন। তাঁর ভাবনা ছুটে চলেছে জোর কদমে—উৎসাহের আতিশয্যে মাঝে মাঝে হোঁচট খাওয়া ঘোড়ার মত। চশমার পিছনে ধূসর চোখজোড়া অপরাজেয় মমতায় চকচক করছে। কারলাইলের বীরপুরুষের মত তিনি যেন চাইছেন দুনিয়ার লোককে বুকে জড়িয়ে উষ্ণত করে রাখতে।'

নেচাএভের মত এ ব্যক্তিটিও রুশ নিহিলিজ্‌ম্‌-এর সন্তান। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, বিপ্লবী, করুণায় কোমল ও প্রতিভায় উজ্জ্বল দৃষ্টি, চওড়া কপাল, মাথায় টাক ও গালভরা শাদা দাড়ি—সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যক্তিত্ব যে সামনে দাঁড়ালে মাথা আপনি নত হয়। অথচ তাঁর এতটুকু দম্ভ নেই, নেই নিজেকে জাহির করবার তিলমাত্র চেষ্টা। কখন বক্তৃতা দিচ্ছেন বিজ্ঞানীর আসরে, কখন বিপ্লবীদের বৈঠকে, কখন অভিজাতদের সভায়, কখন বা মজুরদের মজলিসে,—সর্বত্র তিনি সমান আত্মবিস্মৃত নিজের মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় নির্বিকার, উদাসীন এবং আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আত্মহারা। গভীর মনীষা ও অটল নীতিবোধ ছাড়া আপনার বলতে তাঁর কিছুই নেই। তাই সবাই হল তাঁর আপনজন, স্বভাবগুণে পেলেন তিনি নেতৃত্বের দায়।

১৮৪২ সালের ৯ই ডিসেম্বর মস্কোতে রুশের ভূতপূর্ব রাজবংশ রুরিকদের পরিবারে পিটার আলেকজাণ্ডার ক্রপটকিনের জন্ম হয়। শিশুকালে মাকে হারিয়ে বাড়ির দাসদাসীর যত্নে তিনি মানুষ হন। পনের বছর বয়স পর্যন্ত পিতার জমিদারীতে বসে তিনি দেখলেন হতভাগ্য ভূমিদাসদের দুর্দশা এবং পতনোন্মুখ অভিজাতশ্রেণীর দম্ভ—শিশুমনে কায়েম হয়ে রইল এই বৈষম্যের ছাপ। ১৮৫৭ সালে তিনি জারের সুনজরে পড়েন এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গে এসে সম্রাটের দেহরক্ষীদের সামরিক শিক্ষালয়ে ভর্তি হলেন। শিক্ষা সমাপনের পর তিনি স্বেচ্ছায় সাইবেরিয়ার প্রান্তরে আমুর কসাক বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এলেন। পাঁচ বছর ধরে এ অঞ্চলের ও তার অপরাধী সমাজের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

১৮৬১ সালের আইনে রুশের ভূমিদাসদের দাসত্ব মোচন হল। কিন্তু মোটা খেসারতের দায়ে তারা জমিদারদের কবল থেকে গিয়ে পড়ল সুদখোরদের খপ্‌পরে। এদিকে পোল্যাণ্ডে রুশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। যে অভিজাতশ্রেণী স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে, নিজ দেশের চাষীদের স্বাধীনতা দিতে তারা নারাজ। ১৮৬৩ সালে চাষীরা ক্ষেপে গিয়ে প্রভুদের বিদ্রোহ প্রচেষ্টা বানচাল করে দিল। এরপর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত জনকয়েক পোল বিদ্রোহী বইকাল রোডে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে গিয়ে বিফল হল। বিচারে তাদের পাঁচজন নেতার প্রাণদণ্ড হল। এসব দেখেশুনে ক্রপটকিন চাকরি ছেড়ে দিলেন।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ ইউনিভার্সিটীতে এসে তিনি গণিত ও ভূগোল নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ১৮৭১ সালে সাইবেরিয়ার পূর্ব দক্ষিণের অজানা অঞ্চলে অভিযান করে তিনি

অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করলেন। এশিয়ার মানচিত্রের এক শূন্যস্থান পূর্ণ হল। রুশ জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটী এই নবীন বৈজ্ঞানিককে সম্পাদকের পদে বরণ করবার প্রস্তাব নিল। তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন কারণ গবেষণার সুখ ও যশের গৌরবে তাঁর অধিকার নেই 'যখন চারদিকে শুধু দুঃখ ও দারিদ্র এবং একটুকরা শুকনো রুটির জন্যে মানুষের লড়াই চলেছে।'[১] বৈদগ্ধ্যকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করবার কোন অবসর এই শ্রেণীদুষ্ট সমাজে নেই। পরে "তরুণদের প্রতি আবেদন" পুস্তিকায় তিনি তরুণ মনীষীদের ডেকে দেখিয়েছেন তাদের শিক্ষাদীক্ষা ও বৃত্তির অসারতা—চিকিৎসা, ব্যবহার, যন্ত্রশিল্প, অধ্যাপনা, সাহিত্য সমস্ত ধনীর পরিচর্যায় নিয়োজিত। সুতরাং বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে যার ন্যায়বোধ আছে তার একমাত্র রাস্তা সমাজবিপ্লব। বিজ্ঞান ও শিল্প জনকল্যাণে সার্থক হতে পারে শুধুমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

এই নবীন সমাজের রূপরেখা ক্রপটকিনের চোখে ফুটে উঠছিল। সরকারী চাকরির মত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেও তিনি জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করলেন, পালিয়ে এলেন ইয়োরোপে।

সে কালের তরুণ বিপ্লবীদের ওপর শ্রমিক আন্তর্জাতিকের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিকের নৈরাজ্যবাদী দলের ঘাটি ছিল জেনেভা। এখানকার জুরা শ্রমিক ফেডারেশন ছিল বাকুনিনের মন্ত্রে দীক্ষিত। ক্রপটকিন এসে এদের সঙ্গে ভিড়লেন। এখান থেকে একতাড়া বিপ্লবী প্রচারপত্র সংগ্রহ করে তিনি গোপনে রুশে ফিরলেন—এসে যোগ দিলেন চাইকভস্কির গুপ্ত সমিতিতে। এই সমিতির প্রধান কাজ ছিল আত্মানুশীলন, কারণ সমিতি বিশ্বাস করত যে 'প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বুনিয়াদ হওয়া উচিত নীতিবান ব্যক্তিত্ব, তা সে প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে যে রাজনৈতিক রূপই গ্রহণ করুক না কেন কিংবা ভবিষ্যতে ঘটনার চাপে যে কর্মপদ্ধতিই অবলম্বন করুক না কেন।'[২] সমিতির কাজ ছিল মস্কো ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আশেপাশে ছাত্রদের জড় করা এবং তাদের মারফত চাষী মজুরদের সঙ্গে সংযোগ করা। স্টেপনিয়াকও এই সমিতিরই সভ্য ছিলেন। তিনি "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা"য় লিখছেন যে ক্রপটকিন যখন বরাডিন ছদ্মনামে আলেকজাণ্ডার-নেভ্‌স্কি জেলায় শ্রমিকদের মধ্যে আন্তর্জাতিকের প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তখন পুলিসের ঘুষ খেয়ে একজন শ্রমিক তাঁকে ধরিয়ে দেয় (৯৬ পৃঃ)।

সকল রাজদ্রোহীর গন্তব্যস্থল পিটার এণ্ড পল দুর্গে ক্রপটকিন আবদ্ধ হলেন। দাদা আলেকজাণ্ডার ছিলেন তাঁর পিঠাপিঠি সোদর ও দোসর। তিনি ভাইকে জেলে দেখতে আসতেন। সস্নেহবশে সাইবেরিয়ায় তাঁর নির্বাসন হল। সেখানে বার বৎসর একাকী অসহায়-ভাবে কাটিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। বোন, ভাই, ভ্রাতৃবধূ যাঁরা ছিলেন আপন জন কেউ পুলিসের নির্যাতন থেকে রেহাই পেলেন না। একটিমাত্র মিথ্যা কথার বিনিময়ে মুক্তিলাভ ও স্বজনের নিষ্কৃতি অর্জনের সুযোগ পুলিস তাঁকে দিয়েছিল। কিন্তু সত্যকে বিকিয়ে স্বাধীনতা পাবার প্রবৃত্তি ক্রপটকিনের চরিত্রে ছিল না।

দু' বছরের মধ্যে তাঁর স্বাস্থ্য এমনি ভেঙে পড়ল যে তাঁকে সেণ্ট পিটার্সবার্গের উপকণ্ঠে এক সামরিক হাসপাতালে নিয়ে আসতে হল। এখানে তিনি একটু নড়াচড়া করবার সুযোগ পেতেন। এই সুযোগ নিয়ে তিনি বাইরের সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন

[১] ক্রপটকিন : মেময়ার্স অব এ রিভলুশেনিস্ট, লণ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড ২, ২০ পৃষ্ঠা।
[২] মেময়ার্স, খণ্ড ২, ১৪ পৃষ্ঠা।

এবং হাসপাতাল থেকে পালালেন। রুশ ছেড়ে তিনি পালিয়ে এলেন ইংল্যাণ্ডে, সেখান থেকে সুইৎজারল্যাণ্ডে এসে আবার জুরা ফেডারেশনকে কর্মক্ষেত্র করে বসলেন। এখানে ১৮৭৮ সালে তাঁর বিয়ে হল সোফী এনানিয়েভের সঙ্গে। তেত্রিশ বৎসর নানা দুঃখ দুর্যোগের মধ্যে এই মহিলা স্বামীকে সেবা সাহচর্য ও যত্ন দিয়ে আচ্ছাদন করে রেখেছেন। দিনরাত পড়া, লেখা আর লণ্ডন, পারি, জুরিক ও জেনেভার মধ্যে দৌড়দৌড়ি ও বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান—এই হল ক্রপটকিনের কাজ। জুরা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তিনি "ল্য রেভল্তে" বা বিদ্রোহী নামে এক পত্রিকা বের করলেন। সুইস সরকার পত্রিকার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবার পর এর নাম বদলে রাখা হল 'লা রেভল্ত' বা বিদ্রোহ। ১৮৮১ সালে রুশ সরকারের তাগিদে সুইস সরকার তাঁকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলেন। ক্রপটকিন এলেন লণ্ডনে, সেখান থেকে ফ্রান্সে। ফরাসী সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। শ্রমিক আন্তর্জাতিকের সভ্য হবার অপরাধে তাঁর পাঁচ বছরের কারাদণ্ড হল। মিয়াদ ফুরবার কিছু আগে তিনি জন-আন্দোলনের চাপে ছাড়া পেলেন (১৮৮৬)। তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে হ্যারোতে ঘর বাঁধলেন। বিভিন্ন পত্রিকায় নৈরাজ্যবাদী প্রবন্ধ লিখে কষ্টেসৃষ্টে জীবিকার সংস্থান হ'ত। ১৮৯৯ সালে তিনি নিজের সম্পাদনায় "ফ্রীডম" নামক মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল—সেই আগুনে ক্রপটকিনের রাষ্ট্রনীতির সংস্কার হল। এতদিন তিনি প্রচার করে এসেছেন যে বৈদেশিক সমরে জনসাধারণের কোন স্বার্থ নেই—সকল অবস্থায় জাতীয় সরকারের বিরোধিতাই তার কর্তব্য। সুতরাং রাষ্ট্র যখন আন্তর্জাতিক সংগ্রামে বিপন্ন তখনই তাকে আঘাত করার প্রশস্ত সময়—ক্রপটকিন তথা নৈরাজ্যবাদী গোষ্ঠীর এইটেই ছিল কূট কৌশল। ক্রপটকিন এই কৌশল বর্জন করে জনতাকে আহ্বান করলেন মিত্রশক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য করবার ও জার্মান সামরিক শক্তিকে রুখবার জন্যে। সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী মহলে ছি-ছি পড়ে গেল। লেনিন তাঁকে 'সুবিধাবাদী ও মেরুদণ্ডহীন যুদ্ধবাজ' বলে গালি দিলেন, স্টালিন বললেন 'বোকা বুড়োটার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।' আর নৈরাজ্যবাদীর দল ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। ক্রপটকিন, জ্যাঁ গ্রেভ, পল রুকু প্রমুখ যোলজন আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক ইস্তাহার প্রচার করলেন। এর পাল্টা বিবৃতি দিলেন মালাটেস্টা, শ্যাপিরো, এম্মা গোল্ডম্যান প্রভৃতি। দ্বিতীয় পক্ষ হল দলে ভারি। ক্রপটকিনের আবেদন অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হল।

যুদ্ধের অবসানে মাতৃভূমিতে আবির্ভাব হল আরাধ্য বিপ্লব দেবতার। ক্রপটকিন ভাবলেন বুঝি মুক্ত জীবনের আশীর্বাদ নিয়ে নবীন রুশের জন্ম হল। এই জন্মোৎসবে শরিক হবার জন্যে তিনি দেশে ফিরে এলেন। যখন দেখলেন যে জনতার উদ্যোগের পেছনে রয়েছে বলশেভিক দলের বজ্রমুষ্টি তখন তাঁর চৈতন্য হল—তিনি কঠোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। রুশ সঙ্কটের চাপে পড়ে নৈরাজ্যবাদীদলের ফাটল বন্ধ হল।

প্রতিদ্বন্দ্বী দল ও মতগুলিকে সমূলে বিনাশ করলেও বলশেভিকরা ক্রপটকিনকে ঘাটাতে সাহস করেনি। জারের সরকার যেমন জনমতের ভয়ে টলস্টয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি, বলশেভিক সরকারের ক্রপটকিন সম্বন্ধে তেমনি ভীতি ছিল। মস্কোর চল্লিশ মাইল উত্তরে দ্মিত্রভ্ নামক গ্রামে বসে ক্রপটকিন রুশ সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন—সরকার বাধা দিলেন না কারণ তাঁর লেখা ছাপবার মত ছাপাখানা ও প্রকাশক সোভিয়েত রাশিয়ায় ছিল না।

তখন তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গিয়েছে। হৃদযন্ত্রের কাজ বিকল, পক্ষাঘাতে দেহ অবশ হয়ে আসছে। অবশেষে ১৯২১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী তিনি রোগযন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি

পেলেন—মৃত্যুশয্যার পাশে বসে অশ্রুবর্ষণ করলেন স্ত্রী সোফী, কন্যা সাশা, জামাতা বরিস লেবেডেভ এবং জনকয়েক বন্ধু।

পৃথিবীতে এমন আর কোন বিপ্লবী এবং দার্শনিক বোধ হয় জন্মান নি যিনি বিশ্বের বিদগ্ধ আসরে এবং শ্রমিক ও ভূমিদাসের সমাজে সমান মর্যাদায় বিচরণ করেছেন, যিনি রাজবংশের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে গৃহহীন পলাতক জীবন বরণ করেছেন। অনিশ্চিত জীবনযাত্রায় একটি বস্তু ছিল স্থির নিশ্চিত—আদর্শ এবং জীবনের নৈতিক মান। ১৮৮৫ সালে, যখন তিনি ফরাসী কারাগার ক্লেরভোতে বন্দী তখন সহকর্মী বিখ্যাত ভৌগোলিক এলিসে রুকু তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি "পারোল দ্য' রেভল্তে" বা একজন বিদ্রোহীর কথা নাম দিয়ে সংকলন করেন। ভূমিকায় তিনি লেখেন, 'এই লোকটির প্রতি আপামর জনসাধারণ শ্রদ্ধাশীল, তবুও তাঁহার উপর জেলের বন্ধ দরজা নড়িবার নাম করে না। ইহা দেখিয়া কেহ অবাক হয় না। কারণ ইহা ত' স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় যে শ্রেষ্ঠতার মূল্য গুরু এবং নিষ্ঠার নিত্যসংগী দুঃখবেদনা। ক্রপটকিন জেলে আবদ্ধ আছেন এ কথা ভাবিলে নিজেকে জিজ্ঞাসা না করিয়া পারা যায় না 'আমি মুক্ত কেন? মুক্ত থাকার চেয়ে বেশী যোগ্যতা আমার নাই বলিয়া কি?"

অস্কার ওয়াইল্ড বলেছিলেন আমি দুটি লোক দেখেছি যারা সত্যিই সুখী এবং তাদের একজন ক্রপটকিন। রম্যাঁ রল্যাঁ বলেছিলেন টলস্টয় যা প্রচার করেছেন ক্রপটকিন তাই হয়েছেন,—অর্থাৎ তিনি খাঁটি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নৈরাজ্যবাদী। ফরাসী শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে বলত 'নত্র্ পিয়ের'—'আমাদের পিটার।' এই শ্রদ্ধা ও প্রীতি তিনি পেয়েছিলেন চরিত্রগুণে। তাঁর আদর্শে ও আচরণে কোন ফাঁক ছিল না। চরম দারিদ্র্যদশায় পড়েও তিনি কারো কাছে হাত পাতেন নি, কারও দান গ্রহণ করেন নি। বরং যখন যে এসেছে তিনি তার সঙ্গে অভাবের অন্ন ভাগ করে নিয়েছেন। একটি মাত্র বিষয়ে তাঁর সংযম ও মিতাচার ছিল না—সে হল কাজ।

নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও এই বিপ্লবীর বুকে ছিল রসের ফোয়ারা। তিনি হাসতে জানতেন, হাসাতে পারতেন—পাথর নিংড়ে মধু বার করবার কারুকলা তাঁর জানা ছিল। নিরাশ্রয় ভবঘুরে জীবনে যখন একটু স্থিত হয়েছেন—তখন হয়ত হাল্কা মনে পিয়ানোর পর্দা টিপে গান ধরেছেন, পাশের বাড়ির দাসীদের ডেকে তাঁদের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, কিংবা তাদের মেয়েদের নিয়ে নাচের আসর জমিয়ে বসেছেন। ক্রপটকিন শুধু দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—তিনি ছিলেন জীবনশিল্পীও।

ক্রপটকিনের লেখায় একটা অনবদ্য প্রাঞ্জলতা আছে যা প্রুদ'-র রচনায় নেই, যুক্তি ও তথ্যের গাঁথুনি আছে, বাকুনিনে যার অভাব। গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রসঙ্গও তিনি সাধারণের বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন। তিনি ছিলেন বাকুনিনের ভক্ত, যদিও তাঁকে কোনদিন দেখেননি। কিন্তু বাকুনিনের মত তিনি লোককে গরম কথায় তাতিয়ে তুলবার রাস্তা নেননি। তাঁর আবেদন ছিল মানুষের বুদ্ধি ও নৈতিক চেতনায়।

ক্রপটকিনের বহুল রচনার মধ্যে প্রধান ও মৌলিক গ্রন্থ, "ফীল্ডস্, ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্স্" (১৮৯৮), "মেময়র্স অব এ রেভল্যুশনিস্ট" (১৮৯৯), "মিউচুয়েল এড, এ ফ্যাক্টর অব ইভল্যুশন" (১৯০২), "লা কংকেৎ দ্যু প্যাঁ" (১৯০৯) বা রুটির জয় এবং "এথিক্স্" (১৯২১)। "ল্য রেভল্তে"-তে লেখা তরুণদের প্রতি আবেদন (১৮৮০), আইন ও শাসন কর্তৃত্ব (১৮৮০), বিপ্লবী সরকার (১৮৮২) প্রভৃতি প্রবন্ধ ১৮৮৫ সালে "পারোল দ্য' রেভল্তে" নামে সংকলিত হয়। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

"লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়ঁ সোস্যালিসৎ" (১৮৮৬); "ইন রাশ্যান এণ্ড ফ্রেঞ্চ প্রিস্‌ন্‌স্‌" (১৮৮৭)[৩]; "লা মোরাল এনার্কিসৎ" (১৮৯০); "স্টেট : ইট্‌স্‌ হিস্টরিক্যাল রোল" (১৮৯৬); "এনার্কিস্ট কম্যুনিজ্‌ম্‌—ইট্‌স্‌ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌" (১৮৯৬); লানার্কি—সা ফিলসফি, সঁ ইডেয়াল (১৮৯৬); লা সিয়াঁস্‌ মদার্ন এ লানার্কি (১৯০১); দি গ্রেট ফ্রেঞ্চ রিভল্যুশন এণ্ড ইট্‌স্‌ লেস্‌ন্‌স্‌ (১৯১৪); এনার্কিজ্‌ম্‌ (এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকায় লিখিত প্রবন্ধ)।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার প্রবন্ধে ক্রপটকিন লিখছেন যে নৈরাজ্যবাদী দর্শনে তাঁর প্রধান অবদান একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস। নিরাজ সমাজ কল্পনার মেঘলোক থেকে নেমে আসবে না, সর্বসাধারণের বুদ্ধির বিকাশের জন্যেও বসে থাকবে না—সে আসবে বাস্তবের তাগিদে সমাজবিকাশের অব্যর্থ নিয়মে। সমাজের ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতি লক্ষ্য করে, অসংখ্য তথ্য চয়ন করে তিনি দেখিয়েছেন যে তার গতি শাসনহীন যূথকেন্দ্রিক সমাজের দিকে। মানুষের সমাজও প্রকৃতির মত নিয়মানুবর্তী। প্রকৃতির রহস্য উদ্ধার করতে যে বৈজ্ঞানিক শৈলী অবলম্বন করতে হয় মানুষের ভবিষ্যৎ আবিষ্কার করবার জন্যেও সেই পদ্ধতিই গ্রহণীয়।

নক্ষত্রলোক থেকে ব্যক্তিমানস পর্যন্ত সর্বত্র এক ধারা এক রীতি চলে এসেছে। সর্বত্রই উদ্দাম বহুধা গতিশক্তির একটা সামঞ্জস্য বিধানই যেন প্রকৃতির নিয়ম। নভোমণ্ডলে কোটি কোটি গ্রহনক্ষত্র আপন খেয়ালে পাগলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে—কিন্তু পরস্পরে সংঘর্ষ হয় কদাচিৎ। তার কারণ তাদের পরস্পর বিমুখী গতি একটা মীমাংসায় উপনীত হয়েছে—যার ফলে যার যার অক্ষপথে তাদের পরিক্রমা—লক্ষ লক্ষ বছরেও তারা পথভ্রষ্ট হয় না এবং তাদের সংঘর্ষ ঘটে না।

জীবলোকেও একই রেওয়াজ। এক একটি জীবে বহুল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসংখ্য জীবাণুর সমষ্টি, জীবাণুতে যে আবার কত পরমাণু আছে তার ইয়ত্তা নেই। এরা নিজেদের মধ্যে আপস করে নিয়েছে বলেই দেহ সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে।

মানুষের মনই বা কি? মনোবিজ্ঞান বলছে যে সেখানে অজস্র বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষার সংঘাত, অজস্র খেয়ালখুশির সমন্বয়ে গঠিত হচ্ছে ব্যক্তিত্ব। কাম, ক্রোধ, লোভ আবার দয়া মায়া ভালবাসা—একের বিরুদ্ধে অপরের ক্রিয়া সংযত হয়েছে—সকলের সন্ধিক্ষেত্র হল মন।

আবার এ সন্ধি ও মীমাংসা কোথাও চিরস্থায়ী নয়। এ একটা সাময়িক সমাধান। শক্তির ক্রিয়া চিরকাল একভাবে হয় না, গতি চিরকাল একমুখী নয়। এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সমাধানকে খাপ খাওয়াতে হয়। কোন শক্তিকে জোর করে দাবিয়ে রাখলে সামঞ্জস্য ভেঙে যায়। এই প্রকারে নভোলোকে নক্ষত্রপতন ঘটে, জীবনে রোগ ও বিকার দেখা দেয়, মনের ভেতর ঝড় ওঠে। সমাজে বিপ্লব হয় একই কারণে।

চিরচঞ্চল বহুবিধ বিক্ষিপ্ত শক্তির মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান প্রকৃতির ধর্ম। সমাজ এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। সেখানে কারও স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যকে অবহেলা করা চলে না। সকলের স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য সাধনই সমাজের কাজ—স্বার্থ ও কামনা যখন বদলায়, সামঞ্জস্যেরও তখন সংস্কার করতে হয়। এই সজীব সহজ সামঞ্জস্যের জায়গায় যখন রাষ্ট্র

[৩] এ বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ পুলিস গোটা সংস্করণ কিনে নষ্ট করে ফেলে এবং ক্রপটকিন বিজ্ঞাপন দিয়েও একখণ্ড সংগ্রহ করতে পারেননি।

আইনের অচলায়তন স্থাপন করবার চেষ্টা করে তখন বিপ্লব হয় অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ এই বাস্তব সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

> এখন ইহা আর বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নহে; ইহা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।[৪]

"ল এণ্ড অথারিটি" এবং "স্টেট : ইট্‌স্‌ হিস্টরিক রোল" দুটি পুস্তিকায় ক্রপটকিন রাষ্ট্র ও আইনের জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। আদিম সমাজে আইন ছিল না, ছিল অভ্যাস ও প্রথা। শান্তি ও সামঞ্জস্য তাতেই বজায় থাকত। কারও কোন বিত্ত ছিল না তাই বিত্ত নিয়ে বিবাদ ও বিত্তরক্ষার আইনও ছিল না। যাযাবর জাতি কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করে ভূমিবশ হল—একাধিক জাতির মিলনে মিশ্রণে গঠিত হল গ্রাম সমাজ। আদিম যৌথ জীবন তখনো নষ্ট হয়নি। জমি জমার মালিক সারা গ্রাম। সমাজবিধির রক্ষক পঞ্চায়েত। সেখানে পৈত্রিক প্রথা বলবৎ, আইনের বিচার নেই।

কিন্তু ছিল কুসংস্কার, অন্ধ গতানুগত্য, ভীরুতা, চিন্তার আলস্য। সেই সুযোগে ধূর্ত স্বার্থসন্ধীরা এসে আধিপত্য বিস্তার করল,—গ্রামগোষ্ঠীর বিত্ত ও ক্ষমতা করায়ত্ত করে তারা প্রভু হয়ে বসল। পঞ্চায়েতের জায়গায় এল কাজির বিচার, রাজদণ্ড—তার ইজ্জত রক্ষা করবার জন্যে পাইক বরকন্দাজ। তার সঙ্গে হাত মিলাল ধর্মধ্বজ পুরোহিত—লোকের ভাগ্য নিয়ে যার জাদুবিদ্যার ব্যবসায়।

এর বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিবাদ হয়নি তা নয়। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে গড়ে উঠছিল জনপদ, জাতি উপজাতি মিলে এক স্বাতন্ত্র্যশীল মহাজাতি। মধ্যযুগে দেখা যায় ক্ষমতার কেন্দ্রায়নে এরা বাধা দিয়েছে স্যাক্‌সন, কেল্ট, জার্মান, শ্লাভ সবাই আপন আপন কেন্দ্রাতিগ যূথ-সমাজের রক্ষণে যত্নবান। গ্রামের চাষী-সমবায়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গড়ে তুলেছে কারিগর-সংঘ তাদের মিলনে তৈরী হয়েছে পৌরসভা, জুরির আদালত ও নাগরিক বাহিনী। নগর নগরের সঙ্গে মিলে বৃহত্তর আদান-প্রদানের আসর রচনা করেছে। ডোভার উপকূলের পঞ্চবন্দর ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফরাসী ও ওলন্দাজ বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, স্ক্যানডিনেভিয়ান ও জার্মান নগরগুলি সংগঠিত হয়েছে হানিসিয়াটিক লীগে, তার সামিল হয়েছে রুশের নভগরড। এদের মধ্যে যে সব সন্ধি ও চুক্তি হত তার সর্তগুলি পরবর্তী আন্তর্জাতিক নিয়মকানুনের উপকরণ হয়ে দাঁড়াল। নগরে মুক্ত জীবনের পরিবেশে উচ্ছ্বসিত হয়েছে এক অভিনব সৃষ্টিপ্রেরণা যার নিদর্শন গথিক ও রোমানেস্ক স্থাপত্য, র‍্যাফেলের চিত্র, দান্তের কাব্য ও বেকনের বিজ্ঞান।

কালক্রমে নগরযূথের স্বায়ত্তশাসন বিকৃত হল, ক্ষমতা আবদ্ধ হল কয়েকটি বনেদি বংশের গণ্ডিতে। নগরসভায় তারা সর্বেসর্বা। সেখানে নবাগতরা প্রবেশাধিকার পেল না। এক একটি নগরযূথও হয়ে দাঁড়াল সামন্ত প্রভু। চারপাশের কৃষকরা তাদের ভূমিদাস, এদের শ্রমফল ভোগ করে নাগরিকরা ধনী হল। যে নগর একদিন ছিল স্বাধীনতা ও সমন্বয়ের পীঠস্থান সে নগর হল শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, অর্থাৎ নগররাষ্ট্র। শক্তিমান রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রকে গ্রাস করল—তৈরী হল বৃহত্তর জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের চাপে গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগ ও ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে গেল—গ্রামের জমি চাষীর হাত থেকে চলে গেল জমিদারের হাতে।

মিশর, এশিয়া, ভূমধ্য সাগরের উপকূল ও মধ্য ইয়োরোপ সর্বত্র একই ঘটনাচক্রের

[৪] এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্‌—ইট্‌স্‌ বেসিস এণ্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স, ফ্রীডম পাবলিকেশনস, লণ্ডন ১৯০৫, ২ পৃষ্ঠা।

পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রথমে আদিম জাতি, তারপর আত্মনির্ভর গ্রামযূথ, তারপর মুক্ত নগর, শেষে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র—এই পারম্পর্য দেখা গেছে মিশরে, এসীরিয়া পারস্য ও প্যালেস্টাইনে, গ্রীসে ও রোমে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর কেল্ট, জার্মান, শ্লাভ ও স্ক্যানডিনেভিয়ানরা ইয়োরোপে নূতন প্রাণশক্তি নিয়ে এল তার অধিষ্ঠান হল গ্রামের মুক্তজীবনে, তারও অবসান হল রাষ্ট্রের শাসন পীড়নে।

রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের মাধ্যমে। স্বৈরাচারের যুগে আইনের মাহাত্ম্য ছিল না, রাজার ইচ্ছাই ছিল আইন, রাষ্ট্রের নীতি। স্বৈরাচারের উচ্ছেদ করল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—ফরাসী বিপ্লবের কাল থেকে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল এবং আইনশাস্ত্র রচনা করে তার বলে শাসনের গদিতে কায়েম হয়ে বসল। বর্বররা যেমন এককালে পাথরের রাক্ষস দেবতাকে নরবলি দিয়ে পুজো করত, তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেত না, সে দেবতাকে তুষ্ট করবার মন্ত্র জানা ছিল কেবল জাদুকর পুরোহিতের, আজকাল সেই রাক্ষস দেবতার মহিমা পেয়েছে আইন। তার পূজারী এক শ্রেণীর আইনকর্তা

> যাহারা কি বিষয়ে আইন হইবে তাহা না জানিয়া আইন করিতে পারে; যাহারা আজ স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্বন্ধে কোন ধারণা না রাখিয়া পৌরস্বাস্থ্যের আইন পাশ করিতেছে, কাল সেনাবাহিনীর অস্ত্রসজ্জা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে যদিও কোন দিন একটা বন্দুককে নাড়িয়া দেখে নাই; শিক্ষা বিষয়ে বিধান দিতেছে যদিও কোনদিন কোথাও একটি পাঠও দেয় নাই কিংবা নিজ সন্তানদেরও সুশিক্ষা দেয় নাই; যাহারা যে দিকে নজর যায় সেদিকে আইন করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু অপরাধীদের জন্য জেল ও শাস্তি বিধান করিতে ভোলে না যাহাদের দুর্নীতির কলঙ্ক এই আইন কর্তাদের এক হাজার ভাগের এক ভাগও নয়।[৫]

আর বে-আক্কেল জনতা, নিজের ভালমন্দ বুঝবার বুদ্ধি যাদের আদৌ নেই, 'প্রভুদের নির্বাচন করিবার বেলায় তাহারা হয় জ্ঞানের অবতার।'[৬]

এদিকে যন্ত্রশিল্প ও ধনতন্ত্র নিয়ে এসেছে নিদারুণ ধনবৈষম্য, শ্রেণীভেদ। শ্রমিক বিত্ত উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্র ধনিকের করায়ত্ত, শাসকবর্গও তারই তাঁবেদার। মজুর চাইছে সমাজের বিত্তে তার নিজের হিস্সা বুঝে নিতে, উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে। তাদের অন্তরের আশা মন্থন করে উঠেছে সমাজবাদের মন্ত্র, শিল্প ও বিত্তের ওপর সমাজ-কর্তৃত্বের দাবি।

একদল সমাজবাদী বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে এই অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনে উদ্যোগী হয়েছে। তাদের ধারণা শ্রেণীরাষ্ট্রকে জনরাষ্ট্রে পরিণত করে জন-কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভব। শিলারের উপন্যাসে মার্কুইস অব পোসা স্বপ্ন দেখেছিল তার একায়ত্ত ক্ষমতার বলে সে লোকরাজ আনবে, জোলার রোমে পাদরি পিটার স্বপ্ন দেখেছিল যে চার্চের শুভ চেষ্টায় সমাজতন্ত্র আসবে। রাষ্ট্রবাদী সমাজতন্ত্রীরাও এমনি আকাশকুসুমের কল্পনায় মশগুল। তারা রাষ্ট্রের হাতে দেবে অপরিমিত ক্ষমতা—উৎপাদন ও বণ্টনের, শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। তারা দেখছে না যে রাষ্ট্রশক্তির কেন্দ্রায়ণের পরিণাম হবে শান্তি ও স্বাধীনতার অবসান।

---

[৫] ল এন্ড অথরিটি : রজার এন. বলডুইন সম্পাদিত ক্রপটকিনের বিপ্লবী পত্রাবলী, নিউ ইয়র্ক, ১৯২৭, ২০১ পৃষ্ঠা।

[৬] এনার্কিজ্‌ম্ : ইট্‌স্ ফিলজফি এন্ড আইডিয়েল, বলডুইনের সঙ্কলন, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

> ইতোমধ্যে রাষ্ট্র যে সকল কাজ হাতে লইয়াছে তাহার উপর যদি অর্থনৈতিক জীবনের মূল উপাদানগুলি তাহাকে সমর্পণ করা হয়, যথা জমি, খনি, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি, উপরন্তু সে যদি যন্ত্রশিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখার তত্ত্বাবধান শুরু করে তাহা হইলে নূতন করিয়া এক স্বৈরাচারের বাহন সৃষ্টি হইবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্র আমলাতন্ত্রের ও ধনতন্ত্রের ক্ষমতা বাড়াইবে বৈ আর কিছু নয়।[৭]

এরা আর্থিক সম্পর্কগুলি কতটা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারবে তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসবার পর তাদের ভুল ত্রুটি শোধরাবার মত বিনয় থাকবে না। পূর্বতন স্বৈরাচারীদের মত তারাও হবে দাম্ভিক, নিজেদের মনে করবে নির্ভুল সবজান্তা। ফলে এক কালের সাথীরা হবে শত্রু, রাষ্ট্রের ভেতর দেখা দেবে অন্তর্বিরোধ, ষড়যন্ত্র, বিপ্লব।

> তুমি যাহা করিবে তাহাই ঠিক, এরূপ এক অবিসংবাদী কর্তৃত্ব চাপাইয়া সমাজের সংস্কার করিবার চেষ্টা করিও না। পোপ ও সম্রাটদের মত তুমিও বিফল হইবে। এমনভাবে সমাজের সংস্কার কর যাহাতে সহকর্মীরা অবস্থার চাপে পড়িয়া তোমার শত্রু হইয়া না দাঁড়ায়। ঐ ব্যবস্থাগুলিকে বদলাও যাহা কয়েকজনকে অপরের শ্রমফল একচেটিয়া করিবার অধিকার দেয়।[৮]

মজদুরকে ভোটাধিকার দিলে আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার তৈরি করলেই রাষ্ট্র লোকায়ত্ত হয় না। সমাজে যতরকমের বিচিত্র ও বিপরীত স্বার্থ বিদ্যমান তাদের সকলের প্রতিফলন নির্বাচনের মাধ্যমে হতে পারে না, তাদের সন্তুষ্টি সাধন ও সমন্বয় কোন আইনসভা করতে পারে না। নির্বাচন কোনদিন এমন একদল লোক খুঁজে বার করতে পারে নি যারা গোটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার দাবি রাখে, যারা দলীয় মনোবৃত্তির ওপরে উঠে সারা দেশের কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের রূপান্তর হয়। ভূমিদাস প্রথার আমলে ছিল দরবারি শাসন। ধনতন্ত্রের যুগে এল প্রতিনিধিমূলক শাসন। উভয়ত ক্ষমতা রইল শ্রেণীবিশেষের হাতে। সার্বজনীন ভোটাধিকারের কোন দাম নেই, কারণ উৎপাদনশালার চাবিকাঠি যাদের হাতে নির্বাচনের যন্ত্র তাদের স্বার্থের অনুকূল। সুতরাং প্রতিনিধিমূলক সরকারের দ্বারা শ্রমিকের মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না, ঠিক যেমন চার্চ, দৈবাধিকার, সাম্রাজ্যতন্ত্র প্রভৃতির মারফত তা সম্ভব নয়।

শ্রমিক যখন ধনিকের অন্নদাস থাকবে না তখন তার শোষণযন্ত্র রাষ্ট্র হবে অবান্তর।

> মুক্ত শ্রমিকদের প্রয়োজন হইবে স্বাধীন সংগঠনের—যাহার বনিয়াদ স্বেচ্ছাধীন চুক্তি ও সহযোগিতা, যেখানে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বে ঢাকিয়া যায় না।[৯]

এই নিরাজতন্ত্র ভাবীকালের সমাজবিধান যেখানে মানুষ শ্রেণীশোষণ ও রাষ্ট্রশাসনের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। আজকের দিনেও দুনিয়ার অধিকতর ক্ষেত্রে স্বাধীন চুক্তি ও সহযোগিতায় কাজ চলছে। দেশবিদেশের ডাকবিভাগ মিলে আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ন

---

[৭] এনার্কিজ্‌ম্ : এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা।

[৮] লানার্কি দা লেভলুশিয়' সোস্যালিস্ত।

[৯] এনার্কিস্ট কমিউনিজ্‌ম্—ইট্‌স্ বেসিস এন্ড প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্, ৬ পৃষ্ঠা।

আছে, দেশবিদেশের রেলপথে আছে বোঝাপড়া যাতে যাতায়াত আদান-প্রদানে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। তার জন্যে ডাক পার্লামেণ্ট অথবা রেল পার্লামেণ্ট গড়বার দরকার হয় নি। বৈজ্ঞানিকদের সমিতিগুলিও তাদের গবেষণা ও অভিযানের জন্যে পার্লামেণ্ট নির্বাচন করে না। তারা সম্মেলন করে, সেখানে প্রতিনিধি পাঠায়, প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রতিনিধিরা ফিরে আসে আইন নিয়ে নয়, প্রস্তাব নিয়ে। প্রস্তাবে সায় দিলে সমিতি যোগ দেয়, অন্যথায় কোন বাধ্যবাধকতা নেই। লোককার্য পরিচালনা করার এটাই যুক্তিসংগত পদ্ধতি। নৈরাজ্যবাদ সকল ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বহাল করতে চায়।

অনেকের ধারণা ভোটের অধিকার পেলেই মুক্তিলাভ হল। নারীমুক্তির নেত্রীরা এই অধিকারের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

> আমিও চাই মেয়েরা তাহাদের আকাঙ্ক্ষিত ভোটের অধিকার পাক। ইহার অসারতা বুঝিতে তাহাদের পঞ্চাশ বছর কি তারও বেশী সময় লাগিবে আর ইতোমধ্যে তাহাদের নেত্রীরা কায়েমী স্বার্থের রক্ষণে সাহায্য করিবে। ভোটাধিকার পাইয়া শ্রমিকরাও তাহাই করিয়াছিল। ইহারা যে অধিক বুদ্ধিমতী হইবে এমন মনে করিবার কারণ নাই।[১০]

মুক্ত মহিলা তার ঘরের কাজ অন্য মেয়ের ঘাড়ে চাপাবে—একের মুক্তি বাড়াবে অপরের দাসত্বের বোঝা। নারীকে মুক্তি দিতে হলে প্রথমে দিতে হবে গৃহকর্মের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে মুক্তি, দিতে হবে যথেষ্ট অবসর, শিক্ষালাভের ও সমাজজীবনে পুরুষের সঙ্গিণী হবার সুযোগ।

পারি কমিউনের পতনের পর থেকে শ্রমিক আন্তর্জাতিক সংঘে জার্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাট ও ল্যাটিন শ্রমিক সংঘদের মধ্যে বিবাদ ঘনিয়ে উঠল। মার্ক্স্-এর নেতৃত্বে প্রথম দল চাইল সারা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলন এক সংগঠনের আওতায় এক কেন্দ্রীয় সমিতির অধীনে আনতে। বাকুনিনের নেতৃত্বে ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিক সংঘগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সচেষ্ট হল। জার্মানদের আদর্শ কমিউনিজম, ল্যাটিনদের আদর্শ কলেক্‌টিভিজম—যাতে উৎপাদনের উদ্যোগ যৌথ হলেও ভোগ ও বণ্টনের ব্যবস্থা যার যার ইচ্ছাধীন।[১১] একই লক্ষ্যে পৌঁছবার যে আলাদা আলাদা রাস্তা থাকতে পারে এ কথাটা জার্মান সোস্যাল ডেমক্র্যাটরা কিছুতেই বুঝতে চায় নি। সারা মহাদেশ জুড়ে নিজেদের পছন্দমত একটা শ্রমিক আন্দোলন চালাবার ব্যর্থ চেষ্টায় তারা পঁচিশটা বছর নষ্ট করেছে।

১৮৮০ সালে সুইৎজারল্যাণ্ডের জুরা ফেডারেশন তাদের কংগ্রেসে মুক্ত সমাজবাদ বা এনার্কিস্ট কমিউনিস্ট নীতি ঘোষণা করল। তদবধি জুরা হল ইয়োরোপের স্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্র। প্রুদোঁ ও বাকুনিন যে নিরাজ সহযোগী সমাজের ছবি এঁকেছিলেন জুরার ঘড়িওলাদের সামনে ছিল সেই ছবি। শুধু যে এই আদর্শ তুলে ধরবার জন্যেই ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের শ্রমিকদের ওপর তাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয়, তাদের সংগঠনও ছিল এই আদর্শের অনুগামী। তারা কারখানায় কাজ করত না। যার যার ঘরে ঘরে স্বাধীন-ভাবে তারা ঘড়ি তৈরির কাজ করত—কাজে স্বাধীনতা ছিল, মৌলিকতার অবকাশ ছিল।

---

১০ ফ্রীডম প্রেসের পরিচালকের প্রতি মন্তব্য : জর্জ উডকক ও আইভেন এভাকুমোভিক : দি এনার্কিস্ট প্রিন্স, লণ্ডন, ১৯৫০। ৩০১ পৃষ্ঠা।

১১ আন্তর্জাতিকের অন্তর্দ্বন্দ্ব যে শুধু আদর্শ নিয়ে ছিল না সে প্রসংগ আগে আলোচিত হয়েছে। চতুরঙ্গ, কার্তিক-পৌষ ১৩৬৬।

তাদের সংঘে নেতা ও জনতার ফারাক ছিল না—ইউনিয়নের বৈঠকে কোনরকম মতবাদের দোহাই না দিয়ে সমস্যাগুলি আলোচনা করা হত।

> যে সমাজ কাঠাম আমরা কামনা করিতাম তাহা এখানে আদর্শে ও বাস্তবে তলদেশ হইতে গড়িয়া উঠিতেছিল। নৈরাজ্যবাদের আদর্শ বিস্তার করিবার কাজে জুরা ফেডারেশনের ছিল এক বিশিষ্ট ভূমিকা।[১২]

এদের সঙ্গে এক সপ্তাহ থেকে ক্রপটকিন এনার্কিজম-এ দীক্ষা নিলেন। এর আগে তিনি পাঁচ বছর সাইবেরিয়ায় অপরাধীদের মধ্যে কাটিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন শাসন ও শাস্তির ভয় দেখিয়ে যা মানুষকে দিয়ে করান যায় না, তার শুভবুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিলে সে কাজ কত সহজে হাসিল হয়। এই সব নির্বাসিত চোর ডাকাতের সঙ্গে একলা বস্তা বস্তা নোট ও টাকা নিয়ে তিনি দিনের পর দিন শত শত মাইল আমুর নদী পথে অতিক্রম করেছেন। সঙ্গে অস্ত্র ছিল না, তাকে গলাটিপে মেরে ফেললেও কেউ টের পেত না। টাকায় হাত দেওয়া দূরে থাকুক এরা দুর্গম দেশে আপদে বিপদে তাঁকে রক্ষা করেছে। আইনের সাজায় যে চরিত্র ঢাকা পড়েছিল বিশ্বাস ও ভালবাসা তা মেলে ধরেছে।

> সামন্ত প্রভুর পরিবারে মানুষ হইয়া যখন আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করিলাম তখন সে কালের তরুণদের মত আমারও খুব আস্থা ছিল যে ধমক হুকুম ও শাস্তি ছাড়া কাহাকে দিয়া কোন কাজ করান যায় না। কিন্তু প্রথম জীবনেই যখন আমাকে মানুষ লইয়া কারবার করিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ঘাড়ে লইতে হইল তখনই আমি বুঝিতে লাগিলাম যে হুকুম ও শাসনের নীতি এবং আপসে বোঝাপড়ার নীতি এ দুয়ে কত তফাত। প্রথমটি সামরিক কুচকাওয়াজে বেশ কার্যকরী। কিন্তু যেখানে বাস্তব জীবন লইয়া কারবার, যেখানে কার্যসিদ্ধির জন্য বহুর ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছা ও কঠোর উদ্যমের প্রয়োজন সেখানে হুকুম ও শাসন দিয়া কোন কাজ হয় না।[১৩]

শাস্তি দিতে সরকার খুব পটু। জনসাধারণের নির্মাণমূলক উদ্যোগে সরকার কত মনোযোগী ক্রপটকিন তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। বইকাল হ্রদের দক্ষিণে চিতা নামে একটি শহর উঠেছে। সেখানকার লোকেরা প্রহরার জন্যে একটি মিনার তুলবার পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে হিসেব পাঠাল। দু বছর পরে যখন পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়ে এল ততদিনে মালমসলার দাম ও শ্রমিকের মজুরি অনেক বেড়ে গেছে। নতুন করে হিসেব পাঠান হল—আবার সরকারের চিঠি এল দু বছর বাদে, এবং এবারও শহরের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দামও চড়ে গেছে বিস্তর। অগত্যা শহরবাসীরা ডবল করে দাম ধরে হিসেব পাঠাল, হিসেব মঞ্জুর হয়ে এল এবং মিনারের প্ল্যান লালফিতার বাঁধন থেকে মুক্তি পেল।

সাইবেরিয়া ছেড়ে আসবার সময়ে ক্রপটকিন রাষ্ট্রশাসন ও নিয়মানুগত্যের প্রতি সবটুকু শ্রদ্ধা বিসর্জন দিয়ে এলেন।

রাষ্ট্রের এখতিয়ারের বাইরে স্বাধীন উদ্যোগ ও আদান-প্রদানের ক্ষেত্র ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শিল্প-বাণিজ্যের যোগাযোগ, রেডক্রশ সোসাইটীর কাজ, বৈজ্ঞানিকদের আন্তর্জাতিক সভা সমিতি, আন্তর্জাতিক ডাক ইউনিয়ান—এরা লাল ফিতার ধার ধারে না, কোন কর্তার হুকুমের অপেক্ষা রাখে না। ম্যাড্রিড থেকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রেলপথ গেছে দেশ বিদেশের বেড়া ডিঙিয়ে। বিশটা কোম্পানী চুক্তি করে গাড়ি চালাচ্ছে, ভাড়ার আয় অনুপাত মত ভাগ

---

১২ মেময়র্স, খণ্ড ২, ২১১ পৃষ্ঠা।

১৩ মেময়র্স, খণ্ড ১, ২৫০-৫১ পৃষ্ঠা।

করে নিচ্ছে।[১৩] একজন নেপোলিয়ন কিংবা চেঙ্গিজ খাঁ এসে ইয়োরোপকে দলে মুচড়ে তবে এই লাইন পাতবে—সে অপেক্ষায় লোকেদের বসে থাকতে হয় নি।

> সর্বত্র রাষ্ট্রকে তাহার পবিত্র দায়িত্ব বেসরকারী লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। সর্বত্র স্বাধীন সংগঠন ইহার রাজ্যে অনাধিকার প্রবেশ করিতেছে। অথচ যে দৃষ্টান্তগুলি উদ্ধৃত হইল তাহা হইতে আভাস পাওয়া যায় মাত্র ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের অবর্তমানে স্বাধীন চুক্তির সম্ভাবনা কত সুদূরপ্রসারী।[১৪]

সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে সমাজ চাইছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রণ। এর উপর নির্ভর করছে সমাজের প্রগতি, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য। সরকারের একমাত্র কর্তব্য তার কর্ম স্বাধীন আঞ্চলিকগোষ্ঠী ও উৎপাদনসংঘের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

১৮৮৯ সালে লণ্ডনের ডক মজদুরেরা এক বিরাট ধর্মঘট করে। বন্দর থেকে এই ধর্মঘট সারা লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পবাণিজ্য ও নাগরিক জীবন অচল করে তুলেছিল। ইউনিয়ান পাঁচ লক্ষ মজুরকে খাওয়াবার দায়িত্ব নিয়ে প্রমাণ করেছিল যে তারা শুধু লড়াই করতে জানে না, দেশকে রাখতেও তারা পারে। এই ধর্মঘটে ক্রপটকিন এক নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। সমাজ বিপ্লবে শ্রমিক-সংঘের ভূমিকা তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। ১৯০৭ সালে "ফ্রীডম" পত্রিকার স্তম্ভে তিনি শ্রমিকদের অভিনন্দন জানালেন, তাদের সাবধান করেও দিলেন রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জায় করবার মোহে তারা যেন না পড়ে।

তখন এনার্কিস্টরা সর্বত্র ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে—তাদের মধ্যে আশাহত কয়েকজন গোপন ষড়যন্ত্র ও হত্যার পথে নেমেছে, আর কিছু যোগ দিয়েছে সিণ্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে। উভয়ের মধ্যে শেষের দল ক্রপটকিনের আশীর্বাদ লাভ করল। সিণ্ডিক্যালিস্টদের শ্রমিক সংগঠন ও সাধারণ ধর্মঘটের কর্মপদ্ধতিকে তিনি সমর্থন জানালেন।[১৫] ১৯১১ সালে তিনি পাতাউর ও পুজের "সিণ্ডিক্যালিজম্ এণ্ড কো-অপারেটিভ কমনওয়েল্থ্"-এর ভূমিকা লিখলেন। কিন্তু সিণ্ডিক্যালিস্ট সমাধানে তিনি নিঃসংশয় হতে পারেন নি। মজুরদের সিণ্ডিকেট মুক্ত সমাজের কাঠাম তৈরি করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি সমান অধিকারসম্পন্ন গ্রামীণ ও আঞ্চলিক গোষ্ঠীও থাকতে হবে—এ বিশ্বাস তাঁর অটুট ছিল।

১৯০৭ সালে ক্রপটকিন "রাশ্যান রিভলিউশন এণ্ড এনার্কিজম" নামে একটি পুস্তিকা লিখলেন। দুটি দাবি তুললেন তিনি—চাষীর হাতে জমি চাই, জনে জনে আলাদা করে নয়, যৌথ সত্ত্বে। মজুরদের ইউনিয়ানের হাতে চাই কারখানা, খনি, রেলপথ ইত্যাদি। জুন মাসে রুশে দ্বিতীয় ডুমা ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আবার "তাঁ নুভো" বা নতুন কাল পত্রিকার স্তম্ভে এই বাণী প্রচার করলেন। ১৯১৭ সালে নির্বাসন থেকে পালিয়ে এসে লেনিন এই মন্ত্র গ্রহণ করে এর সঙ্গে আর এক দফা দাবি জুড়ে দিলেন,—সকল ক্ষমতা দাও পঞ্চায়েতের হাতে। কথাটা ক্রপটকিনের খুব মনঃপূত হল। কিন্তু বিপ্লবের পরে যখন দেখলেন যে সোভিয়েতগুলি জনতার মুখপাত্র না হয়ে দলীয় যন্ত্রের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠল। সোভিয়েত রুশে তাঁর সমালোচনা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। ১৯১৯ সালে তিনি দিনেমার সাংবাদিক জর্জ ব্র্যাণ্ডেস-এর মারফত 'পশ্চিম ইয়োরোপের শ্রমিকদের প্রতি পত্র' নামে একটি বিবৃতি পাঠান। এতে রুশ বিপ্লব ও সোভিয়েত সরকারের ভালমন্দ

[১৩] এসব দেশে রেলপথ তখনো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়নি।
[১৪] লা ক'কেং দ্য পাঁ, ইংরাজি অনুবাদ, লণ্ডন, ১৯১৩। ১৮৮ পৃষ্ঠা।
[১৫] সিণ্ডিক্যালিজম সম্বন্ধে আলোচনা আগামী সংখ্যায় হবে।

দুই দিক তিনি বিচার করেছেন। সতের শতকে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং উনিশ শতকে ফ্রান্সে গণতন্ত্র স্থাপনের জন্যে যে বিপ্লব ঘটেছিল রুশ বিপ্লব তারই উপসংহার। যে আর্থিক সমতা পূর্বের দুই বিপ্লব আনতে পারে নি রুশ বিপ্লব তা আনতে চেয়েছে। এর আর এক কীর্তি চাষী মজুরের পঞ্চায়েতের মারফত রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবন পরিচালনা করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই লোক সংস্থাগুলি কঠোর দলীয় শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অদূর ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতগুলি নিজ নিজ সত্তা হারিয়ে কলের পুতুলে পরিণত হবে। তখন বিপ্লব ব্যর্থ হবে। সমাজ-বিপ্লব সাধন করতে যে বিপুল সাংগঠনিক উদ্যোগের প্রয়োজন তা জাগিয়ে তোলা কোন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

> স্থানে স্থানে কত প্রকারের বিচিত্র আর্থিক সমস্যা ঘনাইয়া উঠিতেছে, যাহার সমাধান করিতে হইলে যাহারা ঐ বিষয়ে ওয়াকিফহাল, যাহারা উহার সহিত জড়িত এমন অসংখ্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতার দরকার। এই সহযোগিতাকে বাতিল করিয়া দলীয় একনায়কদের হাতে সর্বস্ব অর্পণ করিবার পরিণাম শ্রমিক ইউনিয়ান, আঞ্চলিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি সমাজের প্রাণকেন্দ্রগুলিকে দলের আমলাতান্ত্রিক বিভাগে পর্যবসিত করিয়া বিনাশ করা। আর আজ এখানে তাহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছে।[১৭]

তা বলে বলশেভিক সরকারকে বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা ধৃষ্টতার কাজ হবে। ফরাসী বিপ্লব দমন করবার জন্যে ইংল্যাণ্ড, প্রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া যা করেছিল কোন দেশ যেন সেই হীন দৃষ্টান্ত নকল না করে। বিদেশী আক্রমণ একতান্ত্রিক শাসনকে আরও মজবুত করবে এবং আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রচেষ্টাকে আঘাত করবে। প্রতি-বিপ্লবের চেষ্টাও নিরর্থক। এ উত্তাল বিপ্লব তরঙ্গকে রুখবার সাধ্য কারও নেই। একদিন এই উচ্ছ্বাস আপনি শান্ত হবে তখন পড়বে অবসাদের ভাটা—ঠিক যেমন সমুদ্রের বুকে ঢেউ নেমে আসবার পর একটা শূন্য গহ্বরের উদ্ভব হয়। তখন আসবে নূতন সংগঠনের সুযোগ। নৈরাজ্যবাদীকে ধৈর্য ধরে সেই দিনটির জন্যে বসে থাকতে হবে।

ক্রপটকিন অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসের ছক দিয়েছেন দুখানি বিখ্যাত গ্রন্থে—একটি "ফীল্ড্স, ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্স" অপরটি "লা ক'কেং দ্য পাঁ"। প্রথমটির সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতের মিল লক্ষণীয়। ইয়োরোপের দেশগুলির কৃষি ও শিল্প, আমদানি ও রপ্তানি ইত্যাদির ওপর অজস্র তথ্য সমাবেশ করে তিনি কয়েকটি সূত্রের অবতারণা করেছেন। প্রথমত কারখানার শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, দ্বিতীয়ত কৃষি ও শিল্পে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, তৃতীয়ত মাথার কাজ ও হাতের কাজে মিলন ঘটাতে হবে, চতুর্থত শিক্ষা ও হাতের কাজ একসঙ্গে চলবে।

আজকের যন্ত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য চুলচেরা শ্রমবিভাগ ও অণু পরিমাণ কর্মে অতিদক্ষতা। একজন হয়ত সারাজীবন ধরে শুধু আলপিনের মাথা গোল করছে কিংবা কলমের নিব শান দিচ্ছে। এতে মজুর তার সৃষ্টি প্রেরণা হারিয়ে যন্ত্রের সামিল হয়ে দাঁড়ায়, উৎপাদন প্রণালী একটা ছাঁচের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞতার গুণে এক এক দেশ এক এক শিল্পে

[১৭] বলডুইনের সম্ভয়ন, ২৫৬ পৃষ্ঠা।

একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে। কোন দেশ হয় শিল্পপ্রধান, কোন দেশ কৃষিনির্ভর—প্রথমরা শোষণ করে দ্বিতীয়দের। ইদানীং শিল্পোন্নত দেশগুলির একাধিকার বিপন্ন হয়ে উঠেছে। কৃষিনির্ভর দেশগুলি, যারা এতকাল ফসল ও কাঁচামাল বিদেশে পাঠাত এখন তারা নিজেদের কলকারখানা গড়ে শিল্পপণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা করছে। যেমন জাপান। ইয়োরোপ থেকে মাল আমদানি করা দূরে থাকুক, সে নিজেই তার শিল্পপণ্য নিয়ে ইয়োরোপের বাজার আক্রমণ করেছে।

নতুন বাজার আবিষ্কার করে এই সমস্যার সুরাহা হবে না। দেশের বাজার বাড়াতে হবে, যারা পয়দা করে পণ্য তাদের ভোগে লাগাতে হবে। বিদেশে শিল্পপণ্য পাঠিয়ে তার বদলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠছে দেখে আজকাল শিল্পপ্রধান দেশগুলি নিজেরা শস্য ফলাতে বাধ্য হচ্ছে। শস্য ফলাবে দেশের চাষী আর পণ্য কিনবে দেশের ক্রেতা ক্রমশ এই ব্যবস্থা তাদের মেনে নিতে হবে। এ কিছু অবাস্তব কথা নয়। বহুল সংখ্যাতথ্য হাজির করে ক্রপটকিন দেখিয়েছেন পতিত জমি উদ্ধার, কৃষি সংস্কার, বৈজ্ঞানিক আবাদ প্রণালী ও উৎপাদন সংগঠন এই সকল উপায় অবলম্বন করলে ইংল্যাণ্ডের মত দেশও খাদ্যে স্বাবলম্বী হতে পারে, কিছুদিন আগেও যার দুই তৃতীয়াংশ লোকের অন্ন আসত বিদেশ থেকে। মাটি অন্নদা। যে কোন আবহাওয়ায় যে কোন জমিতে আমরা যা চাই তা ফলাতে পারি কেবল বুদ্ধি খাটিয়ে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ ঘটানোর অপেক্ষা।

চাষবাড়ির আশপাশে উঠবে ছোট ছোট কারখানা। বড় বড় কারখানার যন্ত্রপাতি সহজে বদলান যায় না, ক্রেতার পছন্দ মাফিক মালের চেহারা বদলান তাদের পক্ষে সহজ নয়। এতে কারিগরের সৃজনশক্তি প্রকাশের সুযোগ পায় না, তারা রক্তমাংসের যন্ত্রে পরিণত হয়। ছোট কারখানার যন্ত্রপাতি পালটাবার অসুবিধা নেই, সেখানে কারিগরের ওস্তাদি দেখাবার অবকাশ আছে, সে ক্রেতার সাধ মেটাবার চেষ্টা করতে পারে। বড় কারখানার প্রতিযোগিতায় ছোট কারখানা উৎসন্ন হবে মার্ক্স্-এর এই 'অর্থনৈতিক সূত্র' ভিত্তিহীন। তা যদি হোত তাহলে সুইৎজারল্যাণ্ডের কুটিরশিল্প বড় বড় কারখানার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকত না। শস্তা বিদ্যুৎশক্তি, সহযোগিতা ও উৎপাদনের কৌশল-এর জোরে আজকের যন্ত্রশিল্পের বাজারেও কুটিরশিল্প জায়গা করে নিতে পারে।

কারখানাকে যেতে হবে মাঠে, নির্ভর করতে হবে কারিগরের সহযোগিতা ও উৎপাদনী শক্তির ওপর, পণ্য দিয়ে মেটাতে হবে চাষীর চাহিদা। অবশ্য সব শিল্পকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া যায় না—যেমন লোহা শিল্প। কিন্তু বেশীর ভাগ কারখানা শহরে ভিড় করেছে প্রাকৃতিক কারণে নয়, মুনাফাখোরদের প্রয়োজনে। শিল্পোদ্যোগ যে ধনিকদের হাতে কেন্দ্রায়িত হয়ে চলেছে তার কারণ উৎপাদনের খরচ কমানো নয়, বাজারের ওপর একছত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করা।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের কেন্দ্রায়নে অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নেই, আছে উৎপাদনের বিকেন্দ্রণ ও কর্মক্ষেত্রের সামঞ্জস্যে।

> এমন সমাজ আনিতে হইবে যেখানে প্রত্যেকে হাতের কাজ ও মাথার কাজ দুই-ই করে; যেখানে প্রত্যেক সুস্থ সমর্থ ব্যক্তি শ্রমিক; যেখানে শ্রমিক ক্ষেতেও খাটে কারখানায়ও খাটে এবং যেখানে শ্রমিকসংঘ নিজের উৎপন্ন শস্য ও পণ্যের অধিকাংশ নিজেরাই ভোগ করে।[১৮]

[১৮] ফীল্ড্স্ ফ্যাক্টরীস এণ্ড ওয়ার্কশপ্স্, লণ্ডন, ১৯১২, ২৩ পৃষ্ঠা। অথচ যন্ত্রশিল্পে ক্রপটকিনের বিরাগ ছিল না। তিনি স্মৃতিকথায় লিখছেন—'সুদৃঢ় সুগঠিত যন্ত্র আমার বেশ লাগিত...

এ ব্যবস্থা সেখানেই সম্ভব যেখানে প্রত্যেকটি নরনারী একাধিক প্রকার হাতের কাজ ও মাথার কাজ জানে। সে শিল্প কোথায়? শিক্ষা ও শ্রমে অহিনকুল সম্পর্ক। এমন কি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গেও বাস্তব পরীক্ষার সম্পর্ক কম। ওয়াট, স্টিফেনসন, ফুলটন প্রভৃতি সেকালের মনীষীরা স্কুলে তেমন কিছু শিক্ষা পান নি—তাঁরা হাতে হাতে পরীক্ষা করে যুগান্তকারী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। একালের বৈজ্ঞানিক যাঁরা হাতের কাজ ছেড়েছেন তাঁদের চিন্তা বন্ধ্যা হয়ে আসছে।

> ঐতিহাসিক ও সমাজবেত্তা যদি মানুষকে দুটি একটি ব্যক্তির অথবা কেতাবের মারফত বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও কর্মশালার মাধ্যমে সমগ্রভাবে জানিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে সে জ্ঞান কত খাঁটি হয়! তরুণ চিকিৎসকের যদি রুগ্নের সেবায় হাতে খড়ি হয় এবং সেবিকারা যদি রোগ উপশমের শিক্ষা পায় তাহা হইলে চিকিৎসাবিজ্ঞান ঔষধের অপেক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যার প্রতি কত বেশী নির্ভর করিবে। কবি যদি মাঠে চাষীদের সঙ্গে লাঙ্গল ধরিয়া উদীয়মান সূর্যের সাক্ষাৎ পায়, যদি জাহাজে নাবিকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়া ঝড়ের সহিত লড়াই করে, শ্রম ও বিশ্রাম, দুঃখ ও আনন্দ, যুদ্ধ ও জয় এ সকলের কাব্য যদি তাহার জানা থাকে তাহা হইলে প্রকৃতির কত মধুর রসই না তাহার আয়ত্ত হইবে, মানুষের অন্তরের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইবে কতই না নিবিড়।[১৯]

"লা কঁকেৎ দ্যু প্যাঁ" বা "রুটির জয়" গ্রন্থে গ্রন্থকার আরও মৌলিক তত্ত্বে প্রবেশ করেছেন এবং নিরাজ সমাজের অর্থনৈতিক নক্সা এঁকেছেন। ধনবিজ্ঞানের কারবার আর্থিক প্রয়োজন নিয়ে যার তাগিদে চলে উৎপাদনের কাজ। সুতরাং উৎপাদনের সংগঠন হবে ভোগের প্রয়োজন মাফিক। প্রথমে খুঁজতে হবে সমাজে লোকের চাহিদা কি, তারপর আবিষ্কার করতে হবে ন্যূনতম শক্তিব্যয়ে চাহিদা মিটাবার উপায়। প্রাথমিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়। এই তিনটি মৌলিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে যদি প্রত্যেকে দিনে পাঁচ ঘণ্টা করে সময় দেয় তাহলে বছরে একশ পঞ্চাশ দিনে সকলের মত অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের সংস্থান হতে পারে। এর পর যথেষ্ট অবসর থাকবে শিল্প বিজ্ঞান চারুকলা আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি দ্বারা মনের খোরাক যোগাবার। এই স্বাভাবিক সুস্থ ব্যবস্থা চালু হয় না সংগঠনের দোষে। চাষী যদি বেশী শস্য ফলায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে জমির ভাড়া, সরকারের খাজনা, মহাজনের সুদ। যন্ত্র ও সারের দামও বাড়বে তারপর যদি বা কিছু চাষীর হাতে থাকে তাতে মোটা ভাগ বসাবে শস্যের ব্যবসায়ীরা। যেখানে উৎপাদন সংগঠনে এমন অব্যবস্থা সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথা ও যন্ত্রের সাহায্য পেলেও কৃষির উন্নতি হতে পারে না।

চলতি ধনবিজ্ঞানের ধারা উলটো। আগে প্রয়োজন তার পরে উৎপাদন নয়, অর্থ-শাস্ত্রীরা বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থাকে মোক্ষম বলে ধরে নিয়েছেন তারপর এ থেকে কেমন

যন্ত্রের কাব্য আমি বুঝিতাম। আজকালকার কারখানায় যন্ত্রের কাজে শ্রমিক ক্ষয় হইয়া যায়, ইহার কারণ সারাজীবন ধরিয়া সে একটি যন্ত্রের দাসত্ব ছাড়া আর কিছু করে না। ইহা হয় অব্যবস্থার জন্য, ইহার সঙ্গে যন্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। হয়রানি ও একঘেঁয়ে কাজ সকল ক্ষেত্রেই খারাপ—তা যন্ত্রের কাজই হউক আর মামুলি হাতিয়ারে হাতের কাজই হউক। একথা ছাড়িয়া দিলে আমি বেশ বুঝিতে পারি যন্ত্রের শক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া, যন্ত্রের বুদ্ধিসঙ্গত ও নিখুঁত কাজ দেখিয়া মানুষ কত না আনন্দ পাইতে পারে। আমার মনে হয় উইলিয়ম মরিস যে যন্ত্রকে ঘৃণা করিতেন তাহার কারণ তাঁহার কাব্য প্রতিভায় যন্ত্রের শক্তি ও শ্রী ধরা পড়ে নাই (খণ্ড ২, ১৩৯ পৃষ্ঠা)

[১৯] ফীল্ড্স, ৪০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

করে চাহিদা মেটান যায় তার অঙ্ক কষেছেন। এই ধনবিজ্ঞান হল 'প্রভুভৃত্য সম্পর্কের দৌলতে মানবশক্তির অপচয়ের বিজ্ঞান।' 'বেতন নিয়ে কাজ করা অন্নদাসত্ব—এর পক্ষে যথাসাধ্য উৎপাদন সম্ভব নয় উচিতও নয়।' অর্থশাস্ত্রীদের মতে বর্তমান দুঃখ দুর্দশার কারণ প্রয়োজনীয় রসদের অনুপাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। ঘটনা ঠিক তার বিপরীত। বিজ্ঞানের বলে উৎপাদন শক্তি জনসংখ্যার চেয়ে দ্রুততর বেগে বেড়ে চলেছে। দোষ সংগঠনে, সমাজ-ব্যবস্থায়। পুঁজিপতিদের লক্ষ্য কেমন করে অল্প মজুর দিয়ে অধিক পণ্য উৎপাদন করবে এবং দরকার হলে দাম চড়াবার জন্যে উৎপাদন কমাবে। যথেষ্ট মুনাফা হয় না বলে মালিকরা হাজার হাজার খনিমজুরকে বেকার বসিয়ে রাখবে অথচ গরীবদের ঘরে কয়লা জুটেছে না, হাজার হাজার তাঁতি ছাঁটাই হয়ে যায় এদিকে গরীবদের কাপড় জোটে না, হাজার হাজার চাষী জমি আবাদ করে গরীবদের মুখে অন্ন দিতে পারে না। অথচ ধনীর বিলাসপণ্য যোগাতে যে কত মজুর খাটছে তার লেখাজোখা নেই।

> একজন বড়লোক যখন তাহার ঘোড়াশালের জন্য এক হাজার পাউণ্ড খরচ করে তখন সে একজনের পাঁচ ছয় হাজার দিনের কাজ নষ্ট করে। এখন যাহারা বিবরে মাথা গুঁজিয়া আছে এই পরিশ্রমে তাহাদের জন্য আরামপ্রদ ঘর উঠিতে পারিত। যখন কোন মহিলা তাহার পোশাকের জন্য একশ পাউণ্ড খরচ করে তখন স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে সে অন্তত দু বছরের বাস্তিশ্রম অপব্যয় করিতেছে যাহার সদ্ব্যয় হইলে একশ মেয়েছেলেকে ভদ্র পোশাক পরান যাইত এবং উৎপাদন যন্ত্রের উন্নয়নে প্রয়োগ করিলে আরও বেশী ফল পাওয়া যাইত।[২০]

সুতরাং অতিপ্রজননের ফলে ধনাভাব দেখা দেয় ম্যালথাস ও হার্বার্ট স্পেন্সারের এ সূত্র অসিদ্ধ। এই দলের অর্থশাস্ত্রীরাই আবার বলেন কখন কখন নাকি বাড়তি উৎপাদন হয়, মাল বিকোয় না—তাতেও অভাব দেখা দেয়। অভাব অতি-উৎপাদন জনিত নয়, নিজেদের তৈরী জিনিস উৎপাদকদের কিনবার সাধ্য নেই বলে।

আমাদের যা কিছু ধন ও উৎপাদনের উপকরণ তা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া। তার পিছনে আছে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ, এতে কার কতখানি দান তার হিসেব সম্ভব নয়।

> বিজ্ঞান ও শিল্প, জ্ঞান ও প্রয়োগ, আবিষ্কার ও কার্যকরণ যাহাতে নূতন আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত হইতেছে, বুদ্ধির কসরত ও হাতের কৌশল, মনের ও বাহুর মেহনত,—সব একযোগে কাজ করিতেছে। প্রত্যেকটি আবিষ্কার, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, তিল তিল সঞ্চিত বিত্ত, তার পিছনে আছে অতীত ও বর্তমান কালের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম।[২১]

বৈজ্ঞানিক প্রতিভা জন্মলাভ করে শিল্পপ্রগতি থেকে। হাজার হাজার অখ্যাত আবিষ্কার থেকে উদ্ভাবন হয় নতুন যন্ত্রের। সাহিত্যিকের জন্য ভাষা ও ভাব প্রস্তুত হয়ে আছে, সাহিত্যের আদি থেকে তার ভাণ্ডার জমে উঠছে, পূর্বসূরীদের রচনায় পাঠকের মন রসায়িত হয়েছে, সে জন্যেই আজকের সাহিত্যিকের জয়জয়কার। কাল কালান্ত ধরে চলেছে সৃষ্টির মহাযজ্ঞ, দুনিয়ার মেহনতী জনতা—চাষী মজুর, শিল্পী সাহিত্যিক, দার্শনিক

[২০] এনার্কিস্ট কমিউনিজম, ১২ পৃষ্ঠা।

[২১] লা ক'কেৎ, ৯ পৃষ্ঠা।

বৈজ্ঞানিক—সকলের সমিধ গ্রহণ করে সেই যজ্ঞাগ্নি যে প্রসাদ বিতরণ করছে তাতে কার কতখানি ভাগ, কার কত পাওনা গণ্ডা সে হিসেব করবে কে? হিসেব হোক চাই না হোক, এই যজ্ঞের পায়স আগলে বসেছে জনকয়েক লোভাতুর লোক, যারা এই যজ্ঞকুণ্ডে কিছুই সমর্পণ করেনি। ল্যাংকাশায়ারের লেস বোনার যন্ত্র তিন পুরুষের তাঁতিদের ঘামে তৈলাক্ত হয়েছে, তাদের আজ সেই কাপড়ের কলে কাজও জোটে না। মানুষ ও মাল চলাচল না করলে যে রেলপথ লোহালক্কড়ের ঢিপি হয়ে পড়ে থাকত তার ওপর মৌরুসী পাট্টা জমিয়েছে জনকয়েক অংশীদার যারা রেলপথের ঠিকানাও জানে না।

সুতরাং সুস্থ ও সমদর্শী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিসম্পত্তির জায়গা নেই। সেখানে সব সকলের সম্পত্তি। উৎপাদনকারীরা সমিতি গড়বে, সমিতি হবে কাঁচামাল ও উপকরণের মালিক। সমিতিরা পরস্পর চুক্তি করবে, সম্বন্ধ পাতাবে আদান-প্রদানের জন্যে। প্রত্যেকে কাজ করবে এবং যখন যা দরকার যৌথ ভাণ্ডার থেকে পাবে। টাকা পয়সার রেওয়াজ, মজুর খাটানো মূলধন জমানো—সব উঠে যাবে।

কেহ কেহ টাকার নোটের বদলে যার যার পরিশ্রম অনুসারে হুণ্ডি দেবার প্রস্তাব করেছেন।[২২] তাতে শ্রমিকের দাসত্ব ঘোচে না। মুদ্রা কিংবা হুণ্ডি কোনটা দিয়েই পরিশ্রমের দাম মাপা যায় না। সম্পত্তি প্রথার সঙ্গে সঙ্গে আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সম্পর্কও তুলে দিতে হবে। সবাইকে দিতে হবে প্রয়োজন মত, পরিশ্রম মত নয়। বৃদ্ধ যুবকের চেয়ে পরিশ্রম করে কম কিন্তু তার প্রয়োজন বেশী। শিশুবতী মায়ের প্রয়োজন অন্য নারীর চেয়ে বেশী এবং খাটবার শক্তি কম। এদের পাওনা পরিশ্রম দিয়ে মাপা হয় না।

আজকের ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজেও চারদিকে সবাইকে দরকার মত ভোগ করতে দেবার চলন বাড়ছে। রাস্তা ও সেতুর ওপর হাঁটবার জন্যে কাউকে দাম দিতে হয় না। জাদুঘর, গ্রন্থাগার, ছোটদের ইস্কুল, রাস্তার আলো, কলের জল, বেড়াবার বাগান সব বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়। যখন উৎপাদনের যন্ত্র সাধারণের হাতে আসবে, কেহ অপরের অন্নদাস থাকবে না, তখন উৎপাদন যে অনেক বাড়বে এবং সকলের চাহিদা মেটাতে পারবে তাতে আর সন্দেহ কি?

অবশ্য অনেকের সন্দেহ আছে এ ব্যবস্থায় কেউ কাজ করবে না—বিনা কাজে যখন সব পাওয়া যায় তখন কে বা খেটে মরবে? আশঙ্কাটা ঠিক নয়। মানুষ স্বভাবত অলস নয়। বেকার বসে থাকতে কারও ভাল লাগে না। অসম ধন-ব্যবস্থার জন্যে শ্রমিক কর্মবিমুখ হয়। অধিকন্তু যন্ত্র তাকে যন্ত্র বানিয়ে কাজের আনন্দ কেড়ে নিয়েছে। কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম, অভাব অনটন, মালিকের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ, সব মিলে তাকে অলস করেছে। মজুর স্বাধীন হলে এবং মনের মত কাজ পেলে সাধ করে খাটবে—তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কৌশল যুক্ত হলে কোন অভাব থাকবে না।

কতক কতক কাজ আছে যা নোংরা কিংবা অপ্রীতিকর—যা জোর করে কিংবা টাকার লোভ দেখিয়ে করান হয়, স্বেচ্ছায় কেউ করতে চায় না। টলস্টয় উদাহরণ দিয়েছেন যেমন ময়লা পরিষ্কারের কাজ, জাহাজের বয়লারে কয়লা ঢালার কাজ ইত্যাদি। ক্রুপটকিন বলছেন মুক্ত সমাজে নোংরা ও হয়রানির কাজ থাকবে না। তখন কাজকে পরিচ্ছন্ন ও অনায়াসসাধ্য করবার জন্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হবে।

[২২] যেমন প্রুদঁ।

কারখানা হাপর ও খনিকে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা সুন্দর পরীক্ষাগারের মত স্বাস্থ্যকর ও জমকালো করিয়া তোলা খুবই সম্ভব।[২৩]

হাতের কাজের ওপর মাথার কাজের কৌলীন্য দূর হবে। কালো হাত আর শাদা হাতের তফাত করলেই শাদা কালোর ওপর শোষণ চালাবে। পাঠশালার শিক্ষা হবে প্রকৃতির পরিবেশে হাতের কাজের মারফত। তাতে হাতের কাজ সম্মান পাবে এবং শিক্ষায় আসবে আনন্দ। লেখকরা ছাপাখানার কাজ জানবে, নিজেদের বই নিজেরা ছাপবে।[২৪] প্রত্যেককে একটা না একটা কাজ বেছে নিতে হবে এবং সেই বৃত্তি নিয়ে গড়া সমিতিতে ঢুকতে হবে। পরস্পর চুক্তি হবে, যে কোন সমিতি ও চুক্তিতে আসতে চাইবে না তার পক্ষে টেকাই হবে দায়।

> আমরা তোমাকে আমাদের ঘরবাড়ি, পণ্যভাণ্ডার, রাস্তাঘাট, যানবাহন, স্কুল, মিউজিয়াম ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিতে রাজী আছি এই সর্তে যে বিশ বছর বয়স হইতে পঁয়তাল্লিশ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত তুমি জীবনের আবশ্যক কোন কাজে দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা করিয়া সময় দিবে। কোন উৎপাদন সমিতিতে তুমি যোগ দিবে তাহা নিজেই বাছিয়া লও অথবা নিজেই একটি সমিতি গড়িয়া তোল। শুধু দেখিতে হইবে সমিতি কোন প্রয়োজনীয় কাজ করে। উদ্বৃত্ত সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তুমি যাহার সঙ্গে খুশি মিশিতে পার মিলিয়া যেমন তোমার রুচি আমোদ স্ফূর্তি কর, শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চা কর।
>
> কিন্তু যদি আমাদের ফেডারেশনের হাজার হাজার সমিতির মধ্যে একটিও তোমাকে লইতে না চায়, যদি তুমি কোন প্রকার দরকারী জিনিস উৎপাদন করিতে একেবারেই অক্ষম কিংবা অনিচ্ছুক হও, তাহা হইলে একাকী কিংবা পঙ্গুর মত বসিয়া থাক...তোমাকে আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজের একটি প্রেতাত্মা বলিয়া ধরিয়া লইব...।[২৫]

কোন কোন সমাজবাদী যৌথকরণের ব্যাপারে উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগের বস্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করে, এবং ভোগের বস্তুকে ব্যক্তির হাতে রাখতে চায়। কলকারখানা জমি কাঁচামাল ইত্যাদি হবে সকলের, ভাত কাপড় ঘর থাকবে যার যার। এই সূক্ষ্ম তারতম্যের কোন মানে নেই। গৃহ বিশ্রামের জায়গা যাতে মজুরের দেহযন্ত্র মেরামত হয়। ইঞ্জিন চলতে যে কয়লা পোড়ে তা যেমন উৎপাদনের মসলা মজুরের খাদ্যও তেমন উৎপাদনের মসলা। কামারের পোশাক হাতুড়ি ও নেহাইর মতই উৎপাদনের অপরিহার্য অঙ্গ।

সুতরাং ভোগ্য বস্তুও সার্বজনীন মালিকানায় আসবে। দেশের শস্য এজমালি গোলায় মজুত হবে, বড় বড় প্রাসাদগুলি বাজেয়াপ্ত করে সেখানে বস্তিবাসীদের থাকতে দেওয়া হবে। কাপড়ের আড়ত থেকে সকলে কাপড় পাবে এবং খুশি মত দর্জিকে দিয়ে সেলাই করিয়ে নেবে। সবাই খাটবে সবাই পাবে কিন্তু কেউ কিছু আগলে বসে থাকতে পারবে না।

নতুন সমাজে সকলে সমান হবে, কাউকে কোন মালিকের কাছে শ্রম অথবা বুদ্ধি বিকিয়ে খেতে হবে না। সকলে যার যার সমিতির মারফত উৎপাদনের কাজে বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করবে। সমিতিতে কোন জোর জুলুম নেই, সভ্যদের কাজ গুছিয়ে মিলিয়ে

[২৩] লা ক'কেং, ১৫৮ পৃষ্ঠা।
[২৪] যেমন অনেক লেখক পাণ্ডুলিপি নিজে টাইপ করেন।
[২৫] লা ক'কেং, ২০৬-০৭ পৃষ্ঠা।

নিয়ন্ত্রণ করা তার উদ্দেশ্য যাতে কাজের ফল পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। ব্যক্তির কর্তৃত্ব কোথাও নেই বটে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির উদ্যম ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সর্বত্র। উৎপাদন ও ভোগের জন্যে সমস্বার্থে সমিতিগুলি পরস্পর সংযুক্ত হবে, সকল বৃত্তি, সকল স্বার্থ, সকল অঞ্চলকে নিয়ে যুক্তকরণের বুনোনি দেশ ছেয়ে ফেলবে, অবশেষে দেশের ও জাতির গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে। কোন সম্বন্ধ ও চুক্তি অকাট্য বলে ধরা হবে না। সমাজ যন্ত্র নয়, একটা সজীব দেহ, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং তাদের ক্রিয়াকলাপ যেমন চিরপরিবর্তনশীল সমিতির কার্যকলাপ ও তাদের চুক্তিও তেমন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন সাপেক্ষ। সরকারের জায়গা নেবে স্বাধীন চুক্তি ও যুক্তকরণ। কোন বিবাদ বিসংবাদ উঠলে সালিশি দ্বারা তার নিষ্পত্তি হবে। কাকেও জোর করে খাটান হবে না। সম্পত্তি প্রথা ও শোষণ সম্পর্ক উঠে যাবার ফলে সকলের স্বাভাবিক কর্মস্পৃহা জেগে উঠবে। আলস্য দূর হবে, অভাবও রইবে না।

ক্রুপটকিন নৈরাজ্যবাদের অর্থনৈতিক রূপায়ণে সম্পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য এনেছেন। তাঁর হাতে শুধু যে প্রুদঁ ও বাকুনিনের যুক্তকরণের নীতি বিস্তারিত হয়েছে তা নয়, এ নীতির সঙ্গে গোটা সমাজদর্শনের ঐক্যসাধন হয়েছে। গডউইন ছিলেন ব্যক্তিপ্রবণ, কোন প্রকার সহযোগিতার কল্পনাকে তিনি আমল দেননি। প্রুদঁ ব্যক্তিপ্রবণ হলেও পারস্পরিক চুক্তি ও যুক্তকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। বাকুনিন ছিলেন যৌথবাদী, ফেডারেশনের পিরামিডে তিনি পেয়েছেন একতা ও স্বাধীনতার সমন্বয়। ক্রুপটকিন এই নক্সার ফাঁক পূরণ করলেন প্রয়োজন অনুসারে অবাধ বিতরণের বিধি এনে এবং শ্রমকে শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়ে। এই হল এনার্কিস্ট কমিউনিজম্ বা নিরাজ সাম্যবাদের ছবি যাকে কল্পনা থেকে নামিয়ে এনে বৈজ্ঞানিক আকার দিয়েছেন ক্রুপটকিন।

কেমন করে আসবে এই পরিবর্তন? এত বড় একটা ওলটপালট বিপ্লব ছাড়া সম্ভব নয়। সমাজে যখন ধীর ক্রমবিকাশের গতি বাধা পায় তখন বাধা সরিয়ে আবার তাকে সচল করবার জন্যে বিপ্লব আবশ্যক হয়ে পড়ে। ইতিহাসের ধারা মোড় ফেরে, গতানুগতিক জীবনে ছন্দপতন হয়, নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়। বিপ্লবের চল শান্তভাবে নামে না। তাতে পার ভাঙে, তরী ডোবে। সুতরাং কেমন করে বিপ্লব এড়ান যায় সে প্রশ্ন আসে না, প্রশ্ন আসে কেমন করে ন্যূনতম গৃহযুদ্ধ প্রাণহানি ও রেষারেষি ঘটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। তার জন্যে সকলের আগে চাই দলিত জনগণের মনে উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ আগ্রহ।

এটা হলে দেখা যাবে সুবিধাভোগী শ্রেণীরাও অনেকে এদিকে ঝুঁকেছে। এদের টানবার খুব প্রয়োজন আছে। যাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে বিপ্লব বিপ্লবের আদর্শ তাদের মধ্যে সংক্রামিত হলে তবে ফল প্রসব করে। মালিকদের বিবেক ভূমিদাস প্রথার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে না উঠলে রুশে ১৮৬১ সালে এ প্রথা রদ হত না। আজ তেমনি বুর্জোয়াদের মনে শ্রমিকদের মুক্তির প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, তাদের ভেতর থেকে অনেকে সমাজবিপ্লবের পথে এগিয়ে আসছে।

বিপ্লবের মহড়া হবে পথে ঘাটে পল্লীতে বস্তিতে, সর্বত্র। যেখানে আছে কর্মশালা—মাঠে বা কারখানায় যেখানে দলবেঁধে মানুষ খাটতে নেমেছে সেখানে তাদের মধ্যে জাগিয়ে

তুলতে হবে সংঘ চেতনা, যৌথ অভ্যাস, নূতন সমাজের কল্পনা ও তা গড়বার আকাঙ্ক্ষা। এই মেহনতী জনতা হবে বিপ্লবের কারিগর। বুর্জোয়া বিপ্লবীদের যত রোষ সরকারের ওপর, বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করে নিজেরা গদিতে বসলেই তাদের বিপ্লব সার্থক হল। তাদের বড় আশা যে শোষণ ও দাসত্বের অবসান করবে তাদের 'বিপ্লবী সরকার'। এ আশা বাতুলতা। সরকার মানে আইনানুগত্য, বন্ধ নিয়ন্ত্রিত জীবন, রক্ষণশীলতা আর বিপ্লব মানে স্বাধীন উদ্যোগ, মুক্ত জীবন, ভাঙন ও সৃষ্টি। বিপ্লবী সরকার হল সোনার পাথরবাটি।

'বিপ্লবী সরকার' গণতান্ত্রিক হতে পারে, একতান্ত্রিকও হতে পারে। বিপ্লবের মুখে যখন জনসাধারণের উৎসাহ চরমে উঠেছে, যখন তারা পুরান বিধানের ইমারত ভেঙে গুঁড়ো করছে তখন সেই জোয়ারে বাঁধ দিয়ে নেতারা ভোটপত্র নিয়ে হাজির হয় এবং অনুরোধ করে সমস্ত উদ্যোগ নির্বাচিত সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে। ১৮৭১ সালের বিপ্লবে পারিতে ঠিক এই ঘটেছিল। সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হয়ে বড় বড় বিপ্লবীরা কমিউন গঠন করল। জনতার হাত থেকে তাদের হাতে গেল বিপ্লবের দায়িত্ব। শুরু হল পৌরসভার তর্কবিতর্ক, দস্তরে লাল ফিতার কাজ, নরমপন্থীদের সঙ্গে আপস রফা। শেষ অবধি নগররক্ষার কাজেও তারা এঁটে উঠতে পারল না।

বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের যত কিছু গলদ সব নির্বাচিত 'বিপ্লবী সরকারে' এসে দেখা দেয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দূরে থাকুক এতে তারা বাধাই দেয়। অবশেষে জনতা উত্যক্ত হয়ে রুখে দাঁড়ায় কিন্তু তখন গদির মোহ শাসকদের পেয়ে বসেছে। তারা জন-আন্দোলন দমন করতে অগ্রসর হয়। অসন্তোষ বাড়ে, আর এক দফা বিপ্লবের ঝাপটায় 'বিপ্লবী সরকার' নিপাত হয়।

এই অভিজ্ঞতার পর কোন কোন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক সরকারের বদলে একতান্ত্রিক সরকারের জন্যে তদ্বির করছেন। যে দল সরকারের পতন ঘটাবে তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাবে। তারা জোর করে সমালোচনার কণ্ঠরোধ করবে, বিরুদ্ধাচারীদের ফাঁসি দেবে। এই শাসকদের ফাঁসিকাঠে ঝুলবার যোগ্যতা অর্জন করতে বেশী দেরী হয় না। কারণ একনায়কত্ব চিরকাল বিপ্লববিরোধী। নায়কপুজো রাষ্ট্রপুজোরই নামান্তর।

দল বিপ্লব করে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। তাদের অভ্যুত্থানে যখন জয়লাভ আসন্ন হয় তখন নানাপ্রকারের স্বার্থসন্ধীরা এসে ভিড় করে। তারা দলের সামিল হয় এবং তার সমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করে।

> বিপ্লবের সাংগঠনিক দায়িত্ব এত বিরাট যে কোন সরকার তা নিয়ে সামলাতে পারে না। সমাজ বিপ্লব হইতে যে অর্থনৈতিক বিবর্তন আসিবে তাহা এত ব্যাপক ও এত গভীর, আজকার সম্পত্তি ও বিনিময় প্রথায় আশ্রিত লোকসম্বন্ধগুলিকে এমন করিয়া ঢালিতে সাজিতে হইবে যে একজন বা অনেকজন ব্যক্তির পক্ষে তাহার বিভিন্ন দিককার কাজ সামলানো সম্ভব নয়। ইহা সম্ভব শুধুমাত্র সংঘবদ্ধ সার্বজনীন প্রচেষ্টায়। ব্যক্তিসম্পত্তির অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে বহুমুখী দাবি-দাওয়া ও বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে তাহার সমাধানের জন্য সমস্ত জনসাধারণের সক্রিয় তৎপরতার প্রয়োজন। বাইরের কর্তৃত্ব শুধু বাধা সৃষ্টি করিবে এবং বিবাদ ও বিদ্বেষের পাত্র হইবে।[২৩]

[২৩] রিভলিউশনারী গভর্ণমেণ্ট, ফ্রীডম প্রেস, লণ্ডন, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৪৫, ১১-১২ পৃষ্ঠা।

জনসাধারণ ভুল করে তখন যখন তারা জনকয়েক সবজান্তাকে ভোট দিয়ে তাদের হাতে নিজেদের দায়িত্ব তুলে দেয়। যখন তারা নিজেদের জানা কাজ নিজেদের ভালমন্দ নিজ হাতে নিয়ে বসে তখন ঐ তর্কবাগীশদের চেয়ে অনেক সুষ্ঠুভাবে সে কাজ সম্পন্ন হয়। এর দৃষ্টান্ত লণ্ডনের ডক স্ট্রাইক। যে কোন গ্রাম্য কমিউনে এর নজির মিলবে। অবশ্য গোড়ার দিকে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা ও অনাচার দেখা দিতে পারে। তার প্রতিকার স্বাধীনতা, দাসত্ব নয়। অবাধ স্বাধীনতা যে সামাজিক বিকার আনবে স্বাধীনতাই হবে তার প্রতিষেধক। স্বাধীন সমালোচনার চাপে ক্রমে বাড়াবাড়িগুলো সংযত হবে, ভুলত্রুটিগুলো সংশোধিত হবে।

বিপ্লবের সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে আসে রুটির প্রশ্ন। প্রতিবিপ্লবী শক্তির মোক্ষম অস্ত্র অন্নাভাব। এর চাপে ফ্রান্সের তিন তিনটি বিপ্লব পণ্ড হয়ে গেছে।[২৪] সুতরাং প্রথম থেকেই এমন একটা কৃষিনীতি নিতে হবে যাতে দীর্ঘকাল ধরে অবরোধকারী শত্রুপক্ষের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায়। বিপ্লবের সূচনায় ঘোষণা করতে হবে যে প্রত্যেকের রুটির সুরাহা হবে সর্বপ্রথম। সংবিধান গঠনে সময় নষ্ট না করে সমস্ত শস্য গোলাজাত করতে হবে এবং সবাইকে রেশন মাফিক বিলি করা হবে। যথাসম্ভব নতুন জমি আবাদে আনতে হবে। চাষীদের কাছ থেকে তাদের দরকারী শিল্পপণ্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য নিতে হবে।

রুশ বিপ্লবে দেখা গেল রুটির সমস্যার সমাধান এত সহজে হয় না। ১৯১৯ সালে "পারোল দ্য রেভোল্তে"র রুশ সংস্করণে ক্রপটকিন একটু পুনশ্চ দিয়ে লিখলেন যে প্রতিবেশী দেশগুলোর শত্রুতার ফলে বিপ্লবের সামনে নিদারুণ খাদ্য সঙ্কট দেখা দেয়। যে এক-তৃতীয়াংশ লোকের এখন অন্ন জোটে না তাদের মুখে অন্ন দিতে হবে। আমদানি নেই, উৎপাদন কমেছে আর ভোগের দাবি বাড়ছে। এ অবস্থায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। এর প্রকোপ কিছুটা শান্ত হতে পারে যদি জনতা প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে নিজ হাতে উৎপাদনের দায়িত্ব নেয়।

বিপ্লবকে প্রথম দিন থেকে দেখাতে হবে যে সে নিপীড়িত জনতার জন্যে ন্যায়ের বিধান নিয়ে এসেছে। ভবিষ্যতে প্রতিকার করবার প্রতিশ্রুতি নয়, আজ এই মুহূর্তে প্রতিকার আনতে হবে।

> সকল কাজের বন্দোবস্ত এমনভাবে করিতে হইবে যে বিপ্লবের প্রথম দিন হইতে শ্রমিক বুঝিতে পারিবে যে তাহার সম্মুখে এক নূতন যুগ আসিতেছে, এখন হইতে কাহাকেও রাজপ্রাসাদ নিকটে থাকিতে পুলের নীচে মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হইবে না, কাহাকেও প্রাচুর্যের মধ্যে বসিয়া উপবাস করিতে হইবে না, পশমের দোকানের পাশে পড়িয়া কাহাকেও শীতে মরিতে হইবে না, সকল বস্তু সকলের জন্য—কেবল কথায় নয় কাজেও; বুঝিতে পারিবে যে ইতিহাসে এই প্রথম একটি বিপ্লব ঘটিয়াছে যাহাতে লোককে তাহাদের কর্তব্য শিখাইবার আগে তাহাদের কি প্রয়োজন তাহার বিবেচনা হইতেছে।[২৫]

এ কাজটা হয়না বলেই বিপ্লব বারবার পরাস্ত হয়। নেতারা সমর কৌশল ও সংবিধান নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে আসল কাজ ভুলে যান। ১৮৬৩ সালের পোল অভ্যুত্থান পরিচালনা করেছিল সামন্তরা। রুশ প্রভু ভূমিদাসদের মুক্তি দিল (১৮৬১) কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তাদের মুক্তি দিতে রাজী হল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ফতোয়ার চেয়ে উদার মুক্তিসর্ত দিলে সামন্তরা দাসদের বিপ্লবের পক্ষে পেত। তা তারা করল না। জারের দয়ায় জমি পেয়ে

[২৪] ১৭৮৯, ১৮৩০ ও ১৮৪৮।
[২৫] লা ক'কেং, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা।

পোল চাষীরা প্রভুদের বিদ্রোহ গুঁতিয়ে ঠাণ্ডা করে দিল।

১৭৯৩ সালে ফরাসী বিপ্লবের নায়করা এক প্রবল চাষীবিদ্রোহের সম্মুখীন হয়েছিল। জেকোবিনরা কৃষি উন্নয়নে মন দেয়নি, চাষীর স্বার্থ দেখেনি। পারির অন্নাভাব মেটাবার জন্যে যখন বিপ্লবীরা চাষীর শস্যে হাত দিতে গেল তখন চাষীরা রুখে দাঁড়াল। শস্যের বদলে জেকোবিনরা দিতে চেয়েছিল কাগজের নোট যা বাজারে পড়ন্ত। যদি শস্যের বিনিময়ে তারা চাষীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদন করে সরবরাহ করতে পারত তা হলে এ সংকট দেখা দিত না।

১৮৭১ সালের পারি কমিউনও এই রকম অদূরদর্শিতার জন্যে ব্যর্থ হয়েছিল। পৌরসভা গঠিত হল শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবীদের নিয়ে। কিন্তু সভায় বসবার পর থেকে জনসাধারণের সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ রইল না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করে তারা বসল মালিকদের সঙ্গে আপসের আলোচনায়। দু মাস অবরোধের পর যখন কমিউন আত্মসমর্পণ করল তখন বুর্জোয়ারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের নরম নীতির জবাবে কঠোর প্রতিহিংসা নিতে ছাড়েনি।

ক্রপটকিনের বড় আশা ছিল যে এত শিক্ষার পর জনতা এবার বিপ্লবের পরিচালনা পরিত্রাতাদের হাতে ছেড়ে দেবে না—নিজেদের হাতে রাখবে। তিনি ধরে নিয়েছিলেন শতাব্দী পেরুবার আগেই ইয়োরোপময় নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবের ঝড় উঠবে, তাতে সকল দেশের রাষ্ট্র-কাঠাম ভেঙে পড়বে।[২৯] শতাব্দী পেরুবার আগে স্বপ্ন ভেঙে গেল, রাষ্ট্রকাঠাম ভাঙলো না। ক্রপটকিন দেখতে পেলেন রাষ্ট্র যে বিরাট যান্ত্রিক শক্তির অধিকারী হয়েছে তাতে সে সহজে ঘায়েল হবে না। অন্যদিকে জনসাধারণ স্বাধীনতার চেয়ে সচ্ছলতাকে মূল্য দিচ্ছে বেশী। জনকল্যাণ সাধনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র তাদের মনে কায়েম হয়ে বসেছে। এই মোহ থেকে আগে তাদের মুক্তি না দিলে, স্বাধীনতার মূল্যবোধ না জাগালে সমাজবিপ্লবের কোন সম্ভাবনা নেই। এখন ধৈর্যশীল প্রস্তুতির সময়।

শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব আসবে এ দুরাশা ক্রপটকিনের ছিল না। তিনি হিংসাত্মক উপায়ে বিশ্বাস করতেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে যখন চারদিকে বিপ্লবের আশা ধূলিসাৎ হয়ে গেল তখন ফ্রান্স ও ইটালীতে কিছু কিছু লোক গুপ্তহত্যার আশ্রয় নিল। সরকার-মহল এর মধ্যে ক্রপটকিনকে জড়াতে চেষ্টা করল। এই নির্বোধ হত্যাকাণ্ডগুলির প্রতিবাদ করলেও তিনি হত্যাকারীদের নিন্দা করলেন না। প্রতিহিংসা দিয়ে অত্যাচার রোধ হয় না ঠিক, তাই প্রতিহিংসা কোন কার্যক্রম হতে পারে না। কিন্তু এ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। হিংসার উত্তরে প্রতিহিংসা আসবে। অসন্তোষ নিয়ে যখন বিপ্লবের কারবার তখন প্রতি-শোধজনিত হত্যা তার কর্মকাণ্ডে অবশ্যই দেখা দেবে। ঐ অত্যাচারের জ্বালা যারা অনুভব করেনি তাদের হত্যাকারীদের বিচার করতে বসবার অধিকার নেই।

> তুমি কি তাহাদের সঙ্গে তাহাদের সমান দুঃখভোগ করিয়াছ? যদি না করিয়া থাক তাহা হইলে লজ্জায় লাল হইয়া চুপ করিয়া থাক।[৩০]

যখন দাবি আদায়ের কোন বৈধ উপায় থাকে না তখন সকল দলই হিংসার আশ্রয় নেয়। আর যে সরকার হিংসার নিন্দায় পঞ্চমুখ তিলমাত্র অবাধ্যতা দেখলে সে সঙিন উঁচিয়ে ধরতে কসুর করে না। রাষ্ট্র যে বড় বড় বুলির আড়ালে পাইকারি হারে নরহত্যা করে তাতে কোন

[২৯] লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয় সোস্যালিস্ৎ।
[৩০] লে প্রিজ', ১৮৯০, ৫৭ পৃষ্ঠা।

দোষ নেই। যতদিন যুদ্ধ ও প্রাণদণ্ড থাকবে ততদিন ব্যক্তির কাছে উন্নততর নৈতিক মান আশা করা বৃথা।

ক্রপটকিন বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিতে সকল রকম অপরাধকে দেখেছেন,—এর জন্যে দায়ী করেছেন রাষ্ট্রকে। রুশ ও ফরাসী জেলখানায় থেকে এসে তিনি বলেছেন 'এগুলি রাষ্ট্রপোষিত অপরাধ-শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়।' জেলখানার আবহাওয়ায় চরিত্র সংশোধন দূরস্থান, যতদূর সম্ভব নৈতিক অধঃপতন হয়। কয়েদীর স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে জানোয়ারের মত খাটিয়ে, আত্মীয়স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে, অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে এবং যন্ত্রের মত চালিয়ে জেলখানা তার স্বভাবকে বিগড়ে দেয়। খালাস পাওয়ার পর ভদ্রসমাজে তার স্থান হয় না, আসামী সমাজ তাকে আদর করে ডেকে নেয়। তখন অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে সে বাধ্য হয়। প্রথমবার সে হঠাৎ ভুল করে অপরাধ করে ফেলেছিল। এখন সে জিদ করে অপরাধে নামল। তার শাস্তিদাতারা তার চেয়ে পাকা চোর, এই বিশ্বাস নিয়ে সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হল।

> বড় বড় নগরের নৈতিক ও বাস্তব আবর্জনার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট ভ্রষ্ট মানবসমাজে বছরের পর বছর ধরিয়া হাজার হাজার বালক বালিকা বড় হইতেছে। ইহাদের সত্যিকার কোন ঘরবাড়ি জানা নাই। আজ তাহারা আছে একটা জীর্ণ চালার নীচে, কাল রাত্রিবাস রাস্তার উপরে। তাহাদের তারুণ্যশক্তি সুস্থভাবে নিষ্ক্রমণের পথ পায় না। যখন দেখি মহানগরীর বুকে এই পরিবেশের মধ্যে বালক বালিকারা মানুষ হইতেছে তখন দেখিয়া অবাক হইতে হয় যে তাহাদের মধ্যে এত অল্প কয়েকজন দস্যু ও নরহন্তা হইয়া দাঁড়ায়। আমার দেখিয়া বিস্ময় লাগে মানুষের সামাজিক অনুভূতি কত গভীর, সবচেয়ে বদ প্রতিবেশীরও কতখানি বন্ধুভাব আছে। তা না থাকিলে আরো কত লোক সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিত। এই বন্ধুভাব, হিংসায় অভক্তি না থাকিলে নগরের রাজপ্রাসাদগুলির একখানি ইটও অবশিষ্ট থাকিত না।[৩১]

আইন দিয়ে অপরাধ দমন করা যায় না। তা হলে অপরাধ বন্ধ করবার উপায় কি? একুশ শ বছর আগে চুয়াংৎসে উপায় বাতলেছিলেন। ক্রপটকিনের উপায়ও কতকটা সেই রকম, তাঁর কথায়ও সেই ঝাঁঝ।

> গিলোটিনগুলি পুড়াইয়া দাও; জেলখানাগুলি গুঁড়াইয়া ফেল; বিচারক, পুলিস এবং পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা যে শ্রেণীর লোক সেই গোয়ান্দাগুলিকে তাড়াও; যে ঝোঁকের মাথায় অপরের অনিষ্ট করিয়াছে তাহার সহিত ভাইয়ের মত আচরণ কর; আর সর্বোপরি অলস বুর্জোয়ারা অসৎ উপায়ে যাহা অর্জন করিয়াছে সেই পাপের পসরা লোভনীয় করিয়া দেখাইবার সুযোগ তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লও। দেখিবে সমাজবিরোধী অপরাধ কত কমিয়া যাইবে।[৩২]

নৈরাজ্যবাদী দর্শনে ক্রপটকিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি মিউচুয়েল এণ্ড : এ ফ্যাক্টর অব ইভল্যুশন। তখন ডারউইনের শিষ্যরা প্রচার করছেন যে জীবন সংগ্রামসঙ্কুল,

[৩১] লে প্রিজ', বলড়ইনের সঞ্চয়ন, ২৩১ পৃষ্ঠা।
[৩২] ল এণ্ড অথরিটি, বলডুইনের সঞ্চয়ন, ২১৭ পৃষ্ঠা।

যার জয় হয় সে লক্ষ্মীমন্ত, সে ভাগ্য নিয়ে বেঁচে থাকে, যার হার হয় তার কপালে দুঃখ ও মৃত্যু। এই নিষ্ঠুর সংগ্রাম নিয়েই জীবন, এর দ্বারাই নিয়মিত হয় মানবপ্রগতি। ১৮৮৮ সালে 'জীবন সংগ্রাম এবং মানুষের উপর ইহার ইঙ্গিত' নামে হাক্‌স্‌লীর একটি প্রবন্ধ বেরুল—তাতে তিনি দেখালেন যে জীবজগত একটি গ্লাডিয়েটরের মল্লভূমি এবং আদিম মানুষের জীবন অবাধ অবিরাম সংগ্রামে কণ্টকিত। এর পাল্‌টা জবাবে ক্রপটকিন "নাইনটীন্‌থ্‌ সেঞ্চুরী" পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখলেন। মিউচুয়েল এড এই প্রবন্ধগুলির সংকলন।

ক্রপটকিন তাঁর প্রতিবাদের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন রুশ পশুতত্ত্ববিদ অধ্যাপক কেস্‌লারের কাছ থেকে। ১৮৮৩ সালে তিনি মস্কোতে ল অব মিউচুয়েল এড শীর্ষক বক্তৃতামালায় পশুজগতে বলবানের স্থায়িত্বের সূত্র খণ্ডন করেন। ক্রপটকিন তাঁর কথাগুলি নিজের সাইবেরিয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন, কোথাও অবাধ সংগ্রাম ও শক্তির জয়ের সমর্থন পেলেন না।

আসলে ডারউইন এ কথা বলেন নি। তিনি যখন বলেছিলেন যে যোগ্যতম সেই বাঁচবে, তখন যোগ্য বলতে তিনি শুধু শক্ত ও ধূর্তকে বোঝেন নি, তিনি বুঝেছেন তাদেরও যাদের জীবনে পরস্পর সহানুভূতি আছে। ক্রপটকিন জীবতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে প্রচুর মালমসলা সংগ্রহ করে দেখালেন যে সংগ্রামের মত সমাজবন্ধনও প্রকৃতির নিয়ম।

পিঁপড়ে, মৌমাছি ও উইপোকা থেকে শুরু করে বন্য পশু পর্যন্ত কীট ও পশুজীবনে যৌথচেতনার কতখানি গুরুত্ব তার নজির দেখিয়ে ক্রপটকিন বর্বর জাতির আলোচনায় এসেছেন। নিউগিনির পাপুয়া ও কেপ হর্নের (দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর) ফুয়েজিয়ানদের ভেতর এখনও কোন সর্দার নেই, অপরাধ ও বিবাদ নেই। তারা একসঙ্গে কাজ করে, স্ফূর্তি করে, সন্তান পালন করে। রেড ইণ্ডিয়ান ও এস্‌কিমোদের ভেতরও এই আদিম সমতা বিদ্যমান। প্রাগৈতিহাসিক কালে সেমাইট, গ্রীক ও রোমানদের ছিল এই প্রকার যূথসমাজ। টাসিটাস হানাদার জার্মান উপজাতিদের সম্বন্ধে একই চিত্র এঁকেছেন। প্রাচীন কেল্ট ও শ্লাভ জাতিও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এস্‌কিমোদের সমাজে ব্যক্তিসম্পত্তি এসেছে কিন্তু তারা একটা সীমার বেশি একে বাড়তে দেয় না। কেউ বেশী ধনী হয়ে উঠলে সে সভা ডেকে উৎসব করে উদ্বৃত্ত ধন বিলিয়ে দেয়। এদের জ্ঞাতি এলিউট উপজাতির সঙ্গে দশ বছর কাটিয়ে রুশ মিশনারী ভেনিয়ামিনভ ১৮৪০ সালে লিখছেন যে গত একশ বছরে যাট হাজার লোকের মধ্যে খুন হয়েছে এবং চল্লিশ বছরে আঠার শ লোকের মধ্যে আইনবিরোধী অপরাধ হয়েছে মাত্র একটি করে।

আজকের আন্তর-রাষ্ট্রিক আইনের মত এই সকল উপজাতিরও আইন ছিল। তাদের শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন সম্বন্ধ আন্তর্জাতিক চুক্তি দিয়ে নিয়মিত হত।

আদিম যূথসমাজ ভেঙে যাওয়ার পর এল গ্রাম সমাজ। গ্রামীণ যৌথ উদ্যোগে বিকাশ হল কৃষি ও কুটির শিল্পের। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, পঞ্চায়েতী বিচার, চারুকলা গ্রামের সর্বসাধারণের জন্যে সৃষ্টি হল। তারপর এল শিল্পীসংঘ ও নগর। মধ্যযুগে ইয়োরোপের নগর যে কেবল রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার দুর্গ ছিল তা নয়। এ ছিল গ্রাম সমাজের বিস্তৃত সংস্করণ, সহযোগিতা ও সাহচর্যের ভিত্তিভূমি, যেখানে সকলে আপন আপন রুচি ও দক্ষতা অনুযায়ী বৃত্তি অনুসরণ করত আর সম্মিলিতভাবে সমাজজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলত। নগরে ও নগরের বাইরে ছিল শিল্পীসংঘ বা ভ্রাতৃসংঘ। জীবিকার জন্যে সকলকে কোন না কোন বৃত্তির অনুসরণ করতে হত এবং সমব্যবসায়ীরা মিলে সংঘ গঠন করত। প্রত্যেককে কোন না

কোন সংঘে স্থান করে নিতে হত। একক জীবন ছিল অসম্ভব।

তারপর এল রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজ। ব্যক্তির আনুগত্য হল সংঘের প্রতি নয়, সমাজের প্রতি নয়, মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত রাষ্ট্রের প্রতি। পরস্পরের প্রতি কোন বাধকতা ও কর্তব্য রইল না। মধ্যযুগে শিল্পীসংঘের কারও রোগ হলে অন্যেরা পালা করে তার সেবা করত। এখন রোগীর দায় হাসপাতালের, প্রতিবেশী খবরও রাখে না। বর্বর জাতির সমাজে প্রথা ছিল দু জন লোক যদি মারামারি করে আর একজন খুন হয় তাহলে যারা দাঁড়িয়ে দেখবে আর থামাতে চেষ্টা করবে না তারাও খুনের দায়ে পড়বে। রাষ্ট্রের আমলে মারামারি থামাতে যাওয়া নাগরিকের কর্তব্য নয়, এ দায় পুলিসের। হটেনটটরা খেতে বসবার আগে তিনবার হাঁক দিত যদি কেউ অভুক্ত থাকে তা হলে তার সঙ্গে খাবার ভাগ করে খাবে বলে। আজকালকার সম্ভ্রান্ত নাগরিক দুঃস্থদের ভরণপোষণের জন্যে নির্ধারিত খাজনা দিয়েই খালাস—কে উপোস করে মরল সে ভাবনা তার নয়।

তবুও মানব চরিত্র থেকে রাষ্ট্রের চাপে সমবেদনা ও সহানুভূতির উৎসগুলি একেবারে শুকিয়ে যায় নি। যখন মহাযুদ্ধের হাড়িকাঠে হাজার হাজার লোক বলি হয় সেই উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যেও মানুষের হৃদয়ের সুধা ঝরে পড়তে দেখা যায়।

> কিয়েভের রাস্তা দিয়া যখন অবসন্ন জার্মান ও অস্ট্রিয় যুদ্ধবন্দীরা পা টানিয়া টানিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে তখন চাষী রমণীরা আসিয়া তাহাদের হাতে রুটি আপেল বা দু এক খণ্ড তাম্র মুদ্রা গুঁজিয়া দিয়াছে। শত্রুমিত্র, নায়ক সৈনিক বিচার না করিয়া হাজার হাজার নরনারী আহতদের সেবা করিয়াছে। গ্রামের সমর্থ চাষীরা যুদ্ধে গেলে পর ফ্রান্স ও রুশে বৃদ্ধেরা ও নারীরা গ্রামসভায় বসিয়া স্থির করিয়াছে যে তাহারা জমিগুলি আবাদ করিবে। সারা ফ্রান্স জুড়িয়া লঙ্গরখানা ও অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। এই সকল ও অনুরূপ অনেক ঘটনার মধ্যে লুকাইয়া আছে নূতন জীবনের বীজ। এই বীজ নূতন নূতন প্রতিষ্ঠানে অঙ্কুরিত হইবে, ঠিক যেমন পুরাকালীন সহভাব হইতে একসময়ে সভ্য সমাজের উন্নততম প্রতিষ্ঠানগুলি জন্মলাভ করিয়াছিল।[০০]

মিউচুয়েল এড-এর নৈতিক দিকটার বিশদ আলোচনা করলেন ক্রপটকিন তাঁর শেষ ও অসমাপ্ত গ্রন্থ "এথিক্‌স্‌"-এ। এর আগে ১৮৯০ সালে এই প্রসঙ্গে "লা মোরাল আনার্কিস্‌ৎ" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এর পিছনে একটু ইতিহাস আছে। পারিতে একজন এনার্কিস্ট বন্ধুর একটি মুদিখানা ছিল। সাথীরা এ দোকান থেকে জিনিস নিয়ে দাম দিত না—'প্রত্যেকে তার প্রয়োজন মত পাবে' এই নৈরাজ্যবাদী নীতির দোহাই দিয়ে। দোকানী ক্রপটকিনের দুয়ারে ধর্না দিল। ক্রপটকিন এই পুস্তিকাটিতে নীতিশাস্ত্রের অতি পুরাতন সূত্রটির উল্লেখ করলেন—'অন্যের কাছে যে ব্যবহার তুমি আশা কর অন্যের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিও।' দোকানের পৃষ্ঠপোষকদের নৈরাজ্যবাদী যুক্তির খণ্ডন হল।

আসলে নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি এই সূত্রের চেয়ে ব্যাপক। নীতিধর্ম দেনা-পাওনার কারবার নয়। ব্যবসাদারী সততার চেয়ে এর দাবি বেশী। যে পাওয়ার ও চাওয়ার অতিরিক্ত দিতে পারে, যে দেয় ভালবাসা থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই বেহিসাবী দাতা খাঁটি নীতিবান পুরুষ। পরবর্তী গ্রন্থ "এথিক্‌স্‌"-এ ক্রপটকিন নীতিশাস্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করে তার মর্মার্থ

[০০] মিউচুয়েল এড, লণ্ডন ১৯১৯, ভূমিকা।

ব্যাখ্যা করলেন। প্রুদ'র মত তিনি একে ধর্মীয় শাসন ও অলৌকিক অধ্যাত্মবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। নীতিবোধের মূল তিনি খুঁজে পেলেন প্রকৃতির ভেতর। প্রকৃতি নীতিহীন নয়। সমাজবিকাশের স্বাভাবিক ধারায় নীতিবোধ এসেছে, শুধু মানুষে নয়, ইতর জীবেও। প্রকৃতি 'মানুষের প্রথম নৈতিক শিক্ষক'। জীবে ও মানুষে আছে সমাজবদ্ধ হয়ে থাকবার প্রবৃত্তি, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তি। এইখান থেকে জন্ম ভালবাসার, নীতিবোধের।

> পিঁপড়েরা বাসাটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, পাখি হরিণ কিংবা বানর দলের নিরাপত্তার জন্য আত্মত্যাগ করিতেছে ইহা জীববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সত্য; প্রকৃতির রাজ্যে হামেশা ঘটিতেছে এরূপ ঘটনা। শত শত জীবজাতির মধ্যে যে এই ধারা চলিয়া আসিয়াছে তাহার পশ্চাতে আছে স্বজাতির প্রতি স্বভাবজাত সহানুভূতি, আপদ-বিপদে পরস্পরকে সাহায্য করিবার অভ্যাস এবং এক সচেতন জৈবশক্তি। ডারউইন প্রকৃতিকে চিনিতেন। তিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনা উভয়ের মধ্যে সমাজচেতনা অধিক শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। তিনি যে ঠিক বুঝিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই।[৩৩]

সমাজজীবন নির্ভর করে যূথচেতনার, পরস্পরকে সাহায্য করবার প্রবৃত্তির ওপর। প্রকৃতি জীবকে ঐক্যের প্রেরণা দিয়েছে তা থেকে আসছে নব নব উপায়ে সংহতিকে সুদৃঢ় করবার তাগিদ—ন্যায়বোধ ও নীতিধর্ম।

মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করুক সমাজ অবশ্য এইটেই চায়। সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করা নীতিশাস্ত্রের লক্ষ্য। যে কাজে অপরের ক্ষতি হয় দুঃখ হয় তা গর্হিত। যে কাজে অপরে সুখী ও স্বচ্ছন্দ হয় তা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু এটা যুক্তির কথা, তত্ত্বের কথা, হৃদয়ের আবেগের কথা নয়। ক্রপটকিন দেখাতে চেয়েছিলেন নীতিবোধের মূল আরো গভীর, জৈবধর্মে অন্তর থেকে এর রস আহরিত হয়। কিন্তু এ কাজ তিনি শেষ করে যেতে পারলেন না। এই প্রতিশ্রুতির মাঝপথে এসে তাঁর কলম অবশ হয়ে গেল।

রাষ্ট্রনির্ভর সমাজবাদের বিরুদ্ধে মুক্ত সমাজবাদের গুণগান করেছেন একাধিক আদর্শবান মনীষী, কিন্তু তাঁরা এই আদর্শকে তথ্য ও যুক্তির বলে প্রতিষ্ঠা করেন নি। রাষ্ট্রমুক্ত সমাজে সংহতি ও শৃঙ্খলা কোথা থেকে আসবে, অরাজকতার বিশৃঙ্খলা কেমন করে রুদ্ধ হবে কেহ তার হদিস দেন নি। ক্রপটকিনের মিউচুয়েল এড ও এথিক্‌স্‌ মানব-প্রকৃতির এক নিগূঢ় সত্য উদ্ঘাটন করল যার ওপর মুক্ত সমাজবাদের ভিত্তিস্থাপন হতে পারে।

ক্রপটকিনের নৈরাজ্যবাদ তিনটি স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান,—আর্থিক সমতা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক নীতিবোধ। এর সংক্ষিপ্তসার—

> ধনতন্ত্রের কবল হইতে উৎপাদনের মুক্তি। যৌথ উদ্যোগে উৎপাদন এবং উৎপন্ন দ্রব্যের যথেচ্ছ ভোগ ব্যবহার।
>
> সরকারী শাসন হইতে মুক্তি; সমিতি ও সংহতির মাধ্যমে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ, পরস্পরের সুবিধা ও রুচি অনুযায়ী স্বাধীন সংগঠন—ক্রমশ জটিল,

[৩৩] ডারউইনের ডিসেণ্ট অব ম্যান থেকে ক্রপটকিন একটি নজির দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের উটায় ভ্রমণকালে কাপ্তেন স্টান্‌সবেরি দেখতে পান একটি অন্ধ পেলিক্যানকে দলের অন্য পাখিরা তিরিশ মাইল দূর থেকে মাছ এনে খাওয়াচ্ছে। এথিক্‌স্‌—অরিজিন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৩৪, ৪৩ পৃষ্ঠা।

> বিস্তরমান।
>
> ধর্মীয় নীতিশাস্ত্র হইতে মুক্তি। বাধ্যতাহীন কর্তৃত্বহীন স্বাধীন নীতিবোধ যাহা সমাজজীবন হইতে উত্থিত ও ক্রমশ অভ্যাসে পরিণত।[৩৪]

নিঃসংশয়ে সমাজের গতি এই দিকে। নিরাজতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দুই অবধারিত পথে প্রকৃতির দেওয়া স্বাধিকারবোধ ও যূথচেতনার প্রেরণায় আমরা এগিয়ে চলেছি। দুই পথের সন্ধিস্থল নিরাজ সমাজতন্ত্র আমাদের গন্তব্য স্থান, সেখানে আমাদের উপস্থিতি আসন্ন ও সুনিশ্চিত।

ওভিডের কল্পনা নয়, জেনোর স্বপ্নবিলাস নয়, এই বাস্তব সম্ভাবনার প্রমাণ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হয়ে নিঃশাসন যূথজীবনের প্রেরণা অগণিত অনুষ্ঠানে আত্মপ্রকাশ করছে। যা ছিল বায়ুভুক কল্পনা, আশার আকাশপদ্ম বিশ্বাসে নির্ভরমান সে আদর্শ বাস্তবে অবতরণ করে লোকায়ত্ত হল। ক্রপটকিনের হাতে নৈরাজ্যবাদ এক পূর্ণাবয়ব জীবনদর্শনে ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে উৎক্রান্ত হল।

ক্রপটকিনের দার্শনিক ভাবনা ছিল স্থির বিশ্বাসের উর্ধ্বে, তাঁর বিচারশক্তি কখনো গোড়ামিতে আবদ্ধ হয়নি, ডগ্‌মার জড়তায় পঙ্গু হয় নি। দলগত নিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে নি। ১৯০৭ সালে ইয়োরোপের আকাশে যখন ঈশানের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল তখন নৈরাজ্যবাদীরা এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে প্রস্তাব নিল যে তারা যে কোন উপায়ে সামরিক প্রস্তুতিতে বাধা দেবে, সেনাবিভাগে হরতাল করাবে এবং যুদ্ধ ঘোষিত হওয়া মাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহে অবতরণ করবে। বাকুনিনের প্রবর্তিত এই রাষ্ট্রদ্রোহী বিপ্লবকৌশল ছিল সর্বসম্মত। যুদ্ধ বাধবার পর ক্রপটকিন এই নীতি বর্জন করলেন। জার্মান সামরিক শক্তির আঘাত থেকে পতনোন্মুখ গণতান্ত্রিক ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে তিনি ইয়োরোপের জনতাকে ডাক দিলেন। জারতন্ত্রের অবসানের পর তিনি রুশ বিপ্লবীদের জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করতে নিষেধ করলেন। সারা ইয়োরোপের নৈরাজ্যবাদীরা ক্ষেপে উঠল। লণ্ডনে "ফ্রীডম" পত্রিকাকে ঘিরে যে দল গড়ে উঠছিল তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে এই কাগজে ক্রপটকিন একটি চিঠি ছাপলেন—সহকর্মীদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তাদের আদর্শের সামনে নূতন সংকট সৃষ্টি করেছে জার্মান জঙ্গীরাজ। এই দুরন্ত শক্তিকে হটিয়ে মুক্তি আন্দোলনকে অপঘাত থেকে বাঁচাতে হবে। একাজ সম্ভব একমাত্র জনশক্তির পক্ষে। জার্মান হানাদার বিতাড়িত হলে পর বিজয়ী জনতা ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান করবে।

বিপক্ষকে শান্ত করা দূরে থাক এই পত্র আগুনে ঘি ঢালল। চারদিক থেকে পত্রাঘাতে "ফ্রীডম" পত্রিকা নাজেহাল হয়ে উঠল। সবচেয়ে নিষ্ঠুর আক্রমণ এল ইটালীর নৈরাজ্যবাদী ক্রপটকিনের পরম বন্ধু মালাটেস্‌টার কাছ থেকে।

> শ্রেণীবিরোধ, অর্থনৈতিক মুক্তি, নৈরাজ্যবাদের যত কিছু পাঠ সব যেন ক্রপটকিন ভুলিয়া গেলেন। তিনি বলিতেছেন যুদ্ধ বাধিলে আক্রান্ত দেশের পক্ষ লইয়া সমর-বিরোধীকে অস্ত্র ধরিতে হইবে। কে যে আসল হামলাদার তাহা যথাসময়ে অনুধাবন করিবার সাধ্য সাধারণ শ্রমিকদের নাই। অতএব ক্রপটকিনের 'সমর-বিরোধী'কে তাহার সরকারের হুকুম-ই তামিল করিতে হইবে। ইহার পর 'সমর-

[৩৪] লানার্কি দাঁ লেভল্যুশিয়' সোস্যালিস্ত্‌।

বিরোধিতা'র তথা নৈরাজ্যবাদের কী বা অবশিষ্ট থাকে?

আসল কথা রুপটকিন সমরবিরোধিতার মন্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন কারণ তিনি মনে করেন সামাজিক প্রশ্নের আগে জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। আর আমরা মনে করি যে শ্রমিকদের দাসত্ব কায়েম রাখিবার জন্য প্রভুদের যত প্রকার উপায় জানা আছে তাহার মধ্যে প্রধান জাতিবৈরিতা ও জাতিবিদ্বেষ। সকল শক্তি দিয়া আমরা ইহাতে বাধা দিব।

যুক্তি ও গোঁড়ামির লড়াই বরাবর এই রীতিতে চলে আসছে। একদিকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ, তথ্য ও পরিস্থিতির বিচার, বিচারলব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে আপ্তবাক্যের দোহাই, ব্যক্তিগত আক্রমণ, আবেগের উচ্ছ্বাস। দ্বিতীয় দল সংখ্যায় ভারি হয় এও চিরকালের রীতি। এখানেও সংখ্যালঘু যুক্তি পরাস্ত হল, রুপটকিন সমাজচ্যুত হলেন।

আদর্শ ও উপায়ের মানদণ্ড এক নয়, মহান আদর্শের জন্যে হীন উপায় গ্রহণীয়, তাতে পাপ নেই, বিপ্লবী শাস্ত্রের এই চিরাচরিত নীতি রুপটকিন স্বীকার করেন নি। আপাত-সিদ্ধির আশায় তিনি তাঁর সুনির্দিষ্ট নীতিমানকে তিলমাত্র সঙ্কুচিত হতে দেন নি। একটিমাত্র মিথ্যা কথা, একটুমাত্র স্বীকারোক্তির বিনিময়ে কারামুক্তি যেমন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন তেমন তিনি এমন সব কূটনৈতিক কৌশলের বিরোধিতা করেছেন যাতে নিরাজ সমাজবাদের আদর্শ মলিন হয়। তাঁর সমাজবাদ মানুষের নৈতিক চেতনার ওপর অধিষ্ঠিত—যে কাজে এই চেতনা ক্ষুণ্ণ হয়, রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে কার্যকরী হলেও অন্তিমে তা ক্ষতিকর। রুশ-জাপান যুদ্ধের সময়ে রুশ বিপ্লবীদের মধ্যে কেহ কেহ জাপানের কাছ থেকে সাহায্য নিতে চেয়েছিল, বলশেভিক একনায়কত্বকে উচ্ছেদ করবার জন্যে অনেকে বিদেশী আক্রমণকারীকে ডেকে আনতে চেয়েছিল। প্রস্তাব দুটির একটিও তাঁর কাছে আমল পায় নি। বরং এই নীতিহীন কূটনীতিকে তিনি তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন।

এমন অটল সততা ও সত্যনিষ্ঠা ছিল বলেই শত্রুরাও তাঁকে সমীহ করত। এবং এর জোরেই নিঃসম্বল নির্বান্ধব অবস্থায় শত্রুপুরীতে বাস করেও প্রতিপক্ষের অন্যায়ের নির্ভীক সমালোচনা তিনি করতে পারতেন। ১৯২০ সালে বলশেভিকরা যখন শত্রুপক্ষের লোকদের ধরে জামিন রেখে শত্রুর ওপর চাপ দেবার নীতি অবলম্বন করল তখন রুপটকিন লেনিনকে একটা চিঠি লেখেন। পত্রটি ইতিহাসের একখানি অতুলনীয় দলিল।

> আজিকার প্রাভ্‌দায় মন্ত্রীসভার প্রচারিত একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তি আমি পড়িলাম। দেখিলাম র‍্যাংগেলের সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে জামিন রাখা স্থির হইয়াছে। আমার বিশ্বাস হয় না তোমার কাছেকাছি এমন একজনও নাই যে তোমাকে বলিয়া দিতে পারে এই প্রকার সিদ্ধান্ত তামসিক মধ্যযুগের কথা, জেহাদের যুগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভ্যাণ্ডিভমির ইলিচ, যে সকল আদর্শ ধরিয়া আজ বলিয়া তুমি দেখাইতে চাও তোমার বাস্তব কর্ম তাহার ঠিক বিপরীত।
>
> এও কি সম্ভব তুমি জান না এই জামিনের মানে কি? জামিন মানে এক ব্যক্তি যে নিজের দোষে বন্দী হয় নাই, বন্দী হইয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া তাহার সাথীদের উপর চাপ দেওয়ার সুবিধা শত্রুপক্ষের আছে বলিয়া। এই ব্যক্তির মনের অবস্থা ফাঁসির আসামীর মত যাহাকে অমানুষে ঘাতকেরা প্রতিদিন দুপুরবেলা বলিতেছে যে কাল পর্যন্ত ফাঁসি মুলতবী রহিল। এই উপায় অবলম্বনে যদি

> তুমি সায় দাও তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝিব একদিন তুমি দৈহিক নির্যাতনেও পশ্চাৎপদ হইবে না—যাহা মধ্যযুগে প্রচলিত ছিল।
>
> আশা করি তুমি জবাবে বলিবে না যে ক্ষমতা অব্যাহত রাখা রাষ্ট্রনায়কের ধর্ম, তাহার ব্যক্তিগত কর্তব্য, এই ক্ষমতার উপর কোন প্রকার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে কোন গুরু মূল্য দিতে হইবে। এই মত আজকাল রাজা-মহারাজারাও পোষণ করে না। শত্রুপক্ষের লোক জামিন রাখিয়া যে আত্মরক্ষার কৌশল আজ রাশিয়ায় গৃহীত হইল রাজতন্ত্রের অধীশ্বররা তাহা বহুকাল আগে ছাড়িয়া দিয়াছে...বলিতে পার তোমার কমিউনিজম্‌-এর ভবিষ্যত কি...?

বলশেভিক রাশিয়ায় বসে লেনিনকে এইরূপ চিঠি লেখার স্পর্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল না। চিঠিখানি মনে করিয়ে দেয় বারো বছর আগে টলস্টয়ের একখানি বিবৃতির কথা। জারের পুলিস যখন বিপ্লবীদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালাচ্ছিল তখন মর্মান্তিক বেদনায় টলস্টয় লিখেছিলেন 'আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিতেছি না'। সেদিন টলস্টয়ের কান্না অভিজাততের নিশ্চল বিবেকে নাড়া দিয়েছিল। রুপটকিনের বুকের জ্বালা তাঁকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল, বলশেভিজম্‌-এর ইমারতে একটা আঁচড়ও পড়ল না।

রুপটকিন বহুলাংশে প্রুদঁ ও বাকুনিনের কাছে ঋণী। তাঁর বৈজ্ঞানিক দর্শন নিখুঁত বা নির্দোষ নয়। তাঁর ভুরি ভুরি রচনার মধ্যে কোথাও কোথাও অসঙ্গতি, কোথাও কোথাও ভুলত্রুটি চোখে পড়ে। তিনি চেয়েছেন সকলে মাথার কাজ এবং হাতের কাজ ত' করবেই, হাতের কাজের মধ্যেও মাঠের কাজ ও কলের কাজ সকলকে করতে হবে, যাতে কৃষি ও কারিগরির বৈষম্য দূর হয়। আবার যার যার বৃত্তি নিয়ে আলাদা আলাদা সমিতি গড়বার কথাও তিনি বলেছেন যা হবে ভবিষ্যৎ সমাজের বনিয়াদ। দুটো কথায় একটু অসঙ্গতি রয়েছে। যন্ত্রশিল্পের পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রমবিভাগের তিনি নিন্দা করেছেন, ছোট শিল্পকে যন্ত্রের ওপরে স্থান দিয়েছেন, আবার মুক্ত কণ্ঠে যন্ত্রের গুণগানও করেছেন। যন্ত্রকে গ্রহণ করলে শ্রমবিভাগ ও বৃত্তিবিভাগকেও মানতে হয়। মিউচুয়েল এড্‌-এর জীব ও মানুষের সহযোগ প্রবৃত্তিকে তিনি কিছু অতিরঞ্জন করেছেন। হাক্‌স্‌লী ও হার্বার্ট স্পেন্‌সারের মত তাঁর দৃষ্টিও কিছু একদেশদর্শী। পোকামাকড়, মাছ, সরীসৃপ এদের মধ্যে হিংসার যে বীভৎস মূর্তি দেখা যায়, বের্গশঁর 'সৃষ্টিপর ক্রমবিকাশে' পাতায় পাতায় যার নজির, জীবনের সেটাও একটা দিক যা উপেক্ষণীয় নয়। আদিম জাতিরা পরস্পর সংগ্রামে কোন সংযম রাখত না, পরাজিত শত্রুর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকত না। প্রথম প্রথম তারা শত্রুদের নিঃশেষে নিপাত করত, একটু সভ্য হবার পর তাদের দাসদাসী বানাত। আদিম জাতির কোন শাসন পাঁড়ন ছিল না—এও কাব্যকল্পনা। গোত্রশাসন অথবা মুখশাসন রাষ্ট্রশাসনের চেয়ে কঠোরতায় কম ছিল না। মধ্যযুগের শেষভাগে গ্রামের যৌথ উদ্যোগ ও স্বাধীনতা নাশ করার অপরাধে তিনি রাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছেন। এটা ঠিক নয়। মধ্যযুগের শুরু থেকে গ্রামের চাষী সামন্ততন্ত্রের কবলে পড়ে উৎসন্ন যাচ্ছিল। রাষ্ট্র ছিল দুর্বল, অক্ষম। গ্রামক্ষেত্র গ্রাস করে, চাষীকে ভূমিদাস বানিয়ে, গ্রামোদ্যোগ ভেঙে দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করছিল রাষ্ট্র নয়, জমিদার শ্রেণী।

রুপটকিনের বৈজ্ঞানিক দর্শন এর চেয়ে একটা গুরুতর দোষে দুষ্ট, সে হল তাঁর পরম আশাবাদ। আশার ছলনায় কোথাও তিনি বাস্তবকে তুচ্ছ করেছেন, কোথাও বা অতিরঞ্জন করেছেন। এ বিভ্রান্তির ফাঁদে সকল বিপ্লবীকেই পড়তে হয়। কারণ শুধু বিজ্ঞান নিয়ে

বিপ্লবী হওয়া যায় না, তার সঙ্গে মেশাতে হয় বেশ কিছু স্বপ্নের খাদ, সত্যকে একটুখানি চোখ ঠারতে হয়, প্রতিকূল বাস্তবকে আশার পর্দা দিয়ে আড়াল করতে হয়। রুপটকিন বিজ্ঞানের সত্যনিষ্ঠা ও বিপ্লবের সাধনায় সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। তা হয় না।

তথাপি রুপটকিনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সার্থক। দর্শনের মূল্যায়ন ছিদ্র সন্ধান ও ছিদ্র গণনা করে হয় না। বনস্পতির গায় ছিদ্র থাকে কোটর থাকে, তৃণলতার দেহ সমতল মসৃণ।

তবে কেন তার সাধনা বিফল হল? বিপ্লবী নায়কের সকল গুণে গুণী হয়েও আপামর জনতার শ্রদ্ধাভাজন হয়েও রুপটকিন জন আন্দোলন সৃষ্টি করে যেতে পারলেন না। তাঁর বিপ্লবদর্শন বাস্তবে ফলিত হল না, সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল না। রাষ্ট্রশক্তির পরিমাপে, রাষ্ট্রের পরমায়ু গণনায় তাঁর ভুল হয়েছিল। তিনি বিপ্লবোত্তর সমাজের চিত্র দিয়েছেন, মানুষের বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির সন্ধান দিয়েছেন কিন্তু বৈপ্লবিক সংগঠনের উপায় দেখান নি, সংগ্রাম কৌশল উদ্ভাবন করেন নি। দেশে দেশে ভেসে বেড়িয়ে কোথাও সংগঠনের শিকড় গাড়বার সুযোগও তাঁর ছিল না।

দল ও গোষ্ঠী তৈয়ার করতে হলে যুক্তি ও বিজ্ঞান, স্বপ্ন ও আশা দিয়ে হয় না, সাহস ভালবাসা বলিদান ইত্যাদি গুণপনাও যথেষ্ট নয়,—চাই কূটবুদ্ধি, শিথিল ন্যায়বোধ। এ কাজে চরিত্রের বিশুদ্ধি মস্ত অন্তরায়। রুপটকিনের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যর্থতার জন্যে প্রধানত দায়ী তাঁর নিষ্কলঙ্ক সততা, অনমনীয় বিবেক। রাষ্ট্রসংগ্রামে বীরের ধর্ম পালন করার রেওয়াজ হয়ত বা কোন ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে ছিল, কলিযুগে নেই; থাকলেও খ্রীষ্টান নাইট ও তুর্ক সুলতানদের পর থেকে উঠে গেছে। কীট ও পশুর জীবনমরণ সংগ্রামের মতই করাল ভয়াল রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সংগ্রাম, উভয়ই বাস্তব জৈব সত্য, কোনটিতে ন্যায়নীতির সংযম নেই। এ ফুটবল খেলা নয়, ক্রীড়ামঞ্চের মল্লযুদ্ধ নয়। এই সুস্পষ্ট সত্যটা কি রুপটকিনের চোখে ধরা পড়েনি? তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি কি নীতিবায়ুতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল?

তা নয়। তাঁর নীতিনিষ্ঠা নিছক সংস্কার কিংবা বিবেকের শাসন ছিল না। এর পিছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। তাঁর বিপ্লবকাব্যের আদিকাণ্ডে রাষ্ট্রনিধন, উত্তরকাণ্ডে মুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা। জনরাজকে পরিপ্লুত হতে হবে নূতন মূল্যবোধে, বিপ্লবীর কর্তব্য তার পরিচর্যা তার পরিশীলন। যদি রাষ্ট্রনিধনের সঙ্গে সঙ্গে সেই মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায় তা হলে বিপ্লব হবে লক্ষ্যহীন রক্তপাতের লড়াই। যে সংগ্রামী কার্যসিদ্ধির জন্যে মূল্যবোধকে বলি দিতে পারে সে জয়মাল্য পায়, কালের ফলকে তার নাম উৎকীর্ণ হয়। আর যে সযত্নে তার সৃষ্টি-উপাদানকে রক্ষা করে, যশ ও খ্যাতিকে উপেক্ষা করে অনাগত কালের প্রতীক্ষায় দিন গণে সে হয় একলা পথের যাত্রী, যুগের কাছে অবজ্ঞাত, যুগের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। কিন্তু বিফলতাই তাঁর সৃজনমনীষার পরিচয়। যে দর্শন কালোত্তর, কালের নিকষে তার যাচাই হয় না। রুপটকিন কালোত্তর ভাবনার ভাবুক তাই যুগের সংগ্রামে তিনি পরাহত, যুগের মানসে তিনি উপেক্ষিত।

বৃষ্টির পরে

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

প্রভাতের বজ্রমুষ্টি আমার দিকে এগিয়ে এল। কুঞ্চিত কপাল। ভুরুর রেখায় স্পন্দন। যেন সে খুব চিন্তা করছে কাজটা করবে কিনা। অগ্র পশ্চাত ভাবছে। ভয়ংকর কিছু করার আগে এ-যুগের সভ্য মানুষকে নানা ভয়াল চিন্তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। প্রভাত দাঁড়িয়ে আছে। আমি জানতাম ওই পর্যন্ত এসে সে থামবে।

বজ্রমুষ্টি আমার নাক কপাল লক্ষ্য করে ছুটে এল না। বরং আস্তে আস্তে তার শক্ত মুঠিটা খুলে গেল, আঙুলগুলি ছড়িয়ে পড়ল; জলে ভেজা পেট-মোটা আঙুরের রঙের নরম ফোলা-ফোলা আঙুলগুলি আমার নাকের সামনে টেবিলের ওপর নেমে এল। তারপর আবার সব কটা আঙুল একত্র করে সিগারেটের বাক্সটা মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে প্রভাত আর একটা সিগারেট বার করতে ব্যস্ত হয়। মৃদু হেসে তার দিকে দেশলাইটা ঠেলে দিই।

তার সিগারেট না জ্বলা পর্যন্ত আমি চুপ থাকি। আমার জানলার বাইরে আকাশ ধূসর হয়ে আছে। বর্ষা আসি আসি করছে। মাত্র কাল বিকেলে বাগানে লক্ষ্য করেছি বৈশাখী চাঁপা বকুলের ঔদ্ধত্য কমে গেছে—আমার লন্-এর অত বড় কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথার আগুন এইবেলা একেবারে নিভবে। বসন্ত জ্বালায় গ্রীষ্ম জ্বালায়—বর্ষার কাজ নেভানো। মনে মনে বললাম। কেবল জল ঢালা। ঠাণ্ডা করে দেওয়া।

নিশ্চয় প্রভাতও মনে মনে কিছু বলছে। পাতলা নীলাভ ধোঁয়ার বলয় তার প্রকাণ্ড মুখমণ্ডল ঘিরে ফেলেছে। চোখ বোজা। আমার কেন জানি মনে হল তখন, এইমাত্র, কৃষ্ণচূড়ার রং নিভে যাওয়া আর সাঁঝার রঙের বিবর্ণ আকাশটা অত মনোযোগ দিয়ে দেখছিলাম বলে প্রভাত নরম হয়ে এল; তার বুকের তরল আগুন আর টগ্‌বগ্ করছে না, জমতে আরম্ভ করেছে, দেখতে দেখতে জুড়িয়ে যাবে।

'প্রভাত!' নরম গলায় ডাকলাম। আর সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করলাম তার মুখের দাড়ি-গোঁফ অবিশ্বাসারকম বেড়ে উঠেছে। বোজা চোখের কোলে গাঢ় কালির পোছ। ক'রাত ঘুম নেই? তার চিহ্ন? আবার মনে মনে হাসি। ঘটা করে আনিদ্রা অনিয়মের বিজ্ঞাপন চোখে মুখে ঝুলিয়ে প্রভাত এখানে ছুটে এসেছে।

সঙ্গে একটা ঝড়ো হাওয়া নিয়ে সে এ-ঘরে ঢুকেছিল না! সব উড়িয়ে দেবে তছনছ করে দেবে—ভেঙে দুমড়ে, দরকার হলে এবাড়ির প্রত্যেকটা ইট গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে আর সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমায় চাপা দিয়ে রেখে সে বেরিয়ে যাবে। এই? এই মন নিয়ে প্রভাত এত সকালে তার ল্যাণ্ডমাস্টার ছুটিয়ে সুদূর ঢাকুরিয়া থেকে আমার বি. টি. রোডের বাড়ির দরজায় এসে নামল?

যেন জেনে শুনেও আমি বন্ধুকে আদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে এনে বসালাম। ওই তো বসে আছে সে। স্থির স্তব্ধ। চোখ বুজে সিগারেট টানছে। আমি জানতাম, আমার লন্-এর কৃষ্ণচূড়ার ম্লান বিষণ্ণ চেহারা, আমার বাগানের বকুল চাঁপার দীর্ঘশ্বাস, আমার ছাদের ওপরকার আকাশের ধূসর রং প্রভাতের মনের ওপর সুন্দর কাজ করবে। তার ঔদ্ধত্য চঞ্চলতা ঈর্ষা বিদ্বেষ থাকবে না। থাকল না তো?

'প্রভাত!' নরম গলায় ডাকলাম।

চোখ খুলল সে। লাল লাল চোখ। প্রভাত যে উগ্র ব্লাড-প্রেসারে ভুগছে আমার অজানা নেই। তার পক্ষে উত্তেজনা বিষ। তুমি হাস। সুন্দর করে হেসে ঠান্ডা মাথায় আমার সঙ্গে কথা বল। দেখছ তো আকাশের রং। শুনেছ না আমার বাড়ির পিছনের বাগানের জঙ্গলে ব্যাং ডাকছে। ওরা কখন ডাকতে শুরু করে জান? আকাশ বেয়ে কলস্বরে পৃথিবীর বুকে জল নামবে। কাল নামতে পারে। আজ বিকেলে নামতে পারে। আজ দুপুরে কি এখনই বর্ষণ আরম্ভ হওয়া বিচিত্র না। ওই দেখ, জানলার ওপারে গাছগুলি স্থির—একটি পাতা নড়ছে না। ওরাও আসন্ন বৃষ্টির গন্ধ টের পেয়েছে। গাছেরা চুপ করে থাকে। জলের গন্ধ পেয়ে ভেককুল মুখর হয়ে উঠল। আনন্দে ওরা ডাকছে, চিৎকার করছে। 'প্রভাত—'

'আমায় কিছু বলছ?' প্রভাত এই প্রথম ঠোঁট খুলল। কিন্তু ঠোঁট জোড়া কাঁপছিল। চাউনিটাও কটমটে। দমে গেলাম। বাইরের উত্তেজনা কমেছে, কিন্তু ভিতরটা যে এখনো উত্তপ্ত অশান্ত।

নিশ্চিন্ত হলাম চাকরকে দেখে। চা নিয়ে এসেছে। যদি এই মুহূর্তে তৃতীয় ব্যক্তি সামনে এসে না পড়ত হয়তো বিপদ ঘটত। ভয়ে ভয়ে আমি প্রভাতের সেই বন্ধ মুষ্টির দিকে আবার চোখ রাখলাম। এমন শক্ত হয়ে আছে তার ডান মুঠিটা।

'চা খাও।' মৃদু স্বরে বললাম। চা ও জলখাবারের প্লেট-এর ওপর লাল লাল চোখ বুলিয়ে প্রভাত গলার একটা বিশ্রী শব্দ করল। 'সন্দেশ চলবে না। সন্দেশ তুলে নাও—নোনতাটা থাক।'

'তাই থাক।' প্রভাতের গলার স্বর অনুকরণ করতে পারলাম না, এবং সেরকম ইচ্ছাও ছিল না যদিও, কেবল কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে চাকরকে বললাম, 'সন্দেশ তুলে নাও।'

নিঃশব্দে চায়ের পর্ব শেষ হল। আমার বুক দুরদুর করছিল। চাকর শূন্য কাপ প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল। তৃতীয় ব্যক্তির অবর্তমানে প্রভাতের মুঠিটা যে আবার শক্ত হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারছিলাম, কেন না এতটা সময়ের মধ্যে তো সে একবারও হাসল না, চাউনিটা নরম করল না। লাল চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে আমার ঘরের দেওয়াল দেখতে লাগল। পূব থেকে পশ্চিমে তার দৃষ্টি সরে যায়, তারপর উত্তরের দেওয়ালের গায়ে সে দু-চোখ স্থির করে ধরে রাখে। আমার পিছন দিক। আমি দেওয়াল দেখছি না, প্রভাতের চোখ দেখছি। দক্ষিণ দিকে আমার মুখ। হন্তদন্ত হয়ে প্রভাত যখন ছুটে এল দক্ষিণ দরজার মুখের চেয়ারে তাকে বসতে দিয়েছি হাওয়া পাবে বলে। মোটা মানুষ। ঘামে পিঠের পাঞ্জাবি ভিজে গিয়েছিল। হয়তো হাওয়া লেগে এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। আমি তার পিঠ দেখছি না, মুখ দেখছি। মিস্ত্রী আসছে না বলে আমার ঘরের পাখা বিকল হয়ে আছে। যদি তা না হত, যদি মাথার ওপর পাখাটা ঘুরত তবে বোধ হয় প্রভাতকে ওই চেয়ারে বসতে দিতাম না। উত্তরের দেওয়াল পিঠ করে দক্ষিণ মুখো হয়ে সে বসত। আর তখন সে ওই দেওয়ালের হুকে ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো নিশ্চয় দেখতে পেত না। পাশাপাশি ঝুলানো ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট দুটোর ওপর স্থির দৃষ্টি মেলে ধরে প্রভাত কী ভাবছে তার ভুরুর বাঁক, কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফের নীচের পেশীর মৃদু স্পন্দন আমায় বলে দিল। যেন আমার ইচ্ছা করছিল একটা পর্দা দিয়ে দেওয়ালটা ঢেকে দিই। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। প্রভাত দেখে ফেলেছে—খেলার সরঞ্জাম দুটো দেখামাত্র অনেক কিছু সে অনুমান করে নিতে পারছে। ঝুনো ব্যারিস্টার। একটা প্রমাণ, এইটুকুন তথ্যের দাগ ধরে ধরে তারা কল্পনার ফিতাকে

হাজার মাইল ছড়িয়ে দিয়ে চমৎকার মামলা দাঁড় করাতে পারে। যা আশঙ্কা করছিলাম! চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়াল। যা আশঙ্কা করছিলাম! ঘর ছেড়ে সে বারান্দায় ছুটে গেল। আর সেখানে দাঁড়িয়ে সে যে নীচের লন, ওধারের ফুলের বাগান, বাগানের পাশে আতা ও ডালিম ঝোপের তলার বেঞ্চিটা দেখবে এতো জানা কথা। ঘরের চেয়ারে বসে ঘামছিলাম। কপালে ঘামের ফোঁটা দাঁড়িয়েছে। হাত তুলে মুছতে পারছি না। অবশ হয়ে গেছে দুটো হাত। যেন কোনোরকমে শিরদাঁড়া খাড়া রেখে আমি স্থির চোখে প্রভাতকে দেখছি। তার পিঠ। আন্দির জামা আবার কি ভিজতে আরম্ভ করল। গেঞ্জির ফুটকি-গুলি পরিষ্কার দেখা যায়। আমি আশঙ্কা করছিলাম। লন, ঝোপের পাশের বেঞ্চি ও পিছনের রজনীগন্ধার জঙ্গল দেখা শেষ করেই এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে প্রভাত বিকৃত স্বরে আমাকে নানারকম জেরা করতে লেগে যাবে। উত্তর তৈরী করে রাখিনি; কিন্তু প্রশ্নগুলি কি হবে অনুমান করতে পারছিলাম। তার মতন আমিও সন্তানের পিতা। তফাৎ হচ্ছে এই যে চোখা চোখা প্রশ্নের বাণে বুক বোঝাই করে আমি তার বাড়িতে ছুটে যাইনি, যেমন সে এখানে ছুটে এল। তফাৎ হচ্ছে এই যে যে-চোখ দিয়ে প্রভাত পৃথিবীকে দেখতে অভ্যস্ত আমার সে-চোখ নেই। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি প্রভাত রেলিং-এর ওপর আর একটু বেশি ঝুঁকে গেছে। চিলের চোখ দিয়ে সে ওপর থেকে নীচের ঘাসের ওপর চুণের দাগ বুলানো ব্যাডমিন্টন খেলার চৌকোণ ঘরটা দেখছে; দেখছে চৌকোণ ঘর থেকে ঝোপের পাশের বঞ্চির দূরত্ব কতটা; দেখছে পাশাপাশি যদি দুজন বেঞ্চিতে পা ঝুলিয়ে বসে আর সূর্য পশ্চিমে হেলতে থাকে তো আতা ও ডালিমের ছায়া দুজনের গলা ও বুকের কতটা ঢাকতে পারে। বা পেরেছিল। না কি ছায়া লম্বা হবার আগে দুজন সেদিনের মতো খেলা সাঙ্গ করে জাল গুটিয়ে র‍্যাকেট কাঁধে ফেলে টুকটুক করে ওপরে উঠে এসেছিল। তারপর? প্রভাত কী ভাবছে জানি না। তার পরের ভাবনা ভয়ংকর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেন তার দেরি আছে। যেন এখনও রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে ঘাড় লম্বা করে দিয়ে প্রভাত শকুনের চোখ দিয়ে আমার লন বাগান খেলার জায়গা কাঠের বেঞ্চি ঝোপঝাড় জরীপ করছে।

'প্রভাত!' খুব সাহস করে নরম গলায় ডাকলাম।

প্রভাত সোজা হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ পর এই প্রথম পকেট থেকে রুমাল বার করে সে ঘাড় গলা মুছল। টলতে টলতে আসছে। তার চোখ দেখে চমকে উঠলাম। লাল রং নেই। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। যেন ক্লান্তিতে সে ভেঙে পড়ছে। যেন অনেক দূরের শ্মশানে প্রিয়জনকে পুড়িয়ে হেঁটে হেঁটে এই মাত্র ঘরে ফিরল। ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সে। আশ্বস্ত হলাম। একটু আগের আশঙ্কাগুলি কাটিয়ে উঠতে বেগ পেতে হয় না। হাসি।

'দেখলে, কী সুন্দর জায়গাটা, কেমন সবুজ নরম ঘাস—'

মাথা নাড়ল সে। অর্থাৎ কিছুই দেখেনি। রুমাল দিয়ে আবার ঘাড় গলা মোছে। নিরস্ত হই না। নিরস্ত হব না মনের এই জোর আছে বলে না আমি হাসতে পারছি। বললাম, 'বিকেল হতে এমন চমৎকার কিচিরমিচির শুরু করে দেয় পাখিগুলি ওই আতা আর ডালিমের ডালে বসে—'

'তুমি চুপ কর, চুপ কর!' হুংকার ছাড়ল প্রভাত। তারপর শুনলাম চাপা গর্জন। যেন নিজের মনে বলছে সে : 'কাবা, কবিত্ব করা হচ্ছে।'

তেতো মতন একটা ঢোক গিললাম। আমি যে-চোখ দিয়ে পৃথিবীটা দেখছি সে-চোখ

প্রভাতের নেই। তাকে তুমি ক্ষমা কর। ঈশ্বরকে ডাকলাম। দিনরাত সে মামলা মোকদ্দমার প্যাঁচ কষছে মাথায়। হয়তো আমাকেই আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে মাথায় ফন্দী আঁটছে। বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া এমন সুন্দর মাঠ ফুলের বাগান রাখা আমার অপরাধ হয়েছে। আদালতে তাই প্রমাণ করবে প্রভাত। চাই কি এ বাড়ির গাছের মাথায় পাখিদের কূজন গুঞ্জনের জন্যও সে আমাকে দায়ী করবে। আমি প্রভাতের চোখ দেখতে লাগলাম। আমার মনে হল লনের কৃষ্ণচূড়া গাছটা যে এই কাঁদন আগেও আগুন ছড়াচ্ছিল আগুন লাগানোর অভিযোগ এনে সে আমায় দোষী সাব্যস্ত করবে। প্রভাত, ফুল ফোটার ব্যাপারে মানুষের হাত নেই। ইচ্ছা করলেই সে সবুজ ডাটার মাথায় রজনীগন্ধার রূপালী বিস্ময় জাগাতে পারে কি। যে জাগাবে সে আকাশ কালো করে আসছে। ঐ দেখ, বৃষ্টি হবে! আর বৃষ্টি পড়লে দেখবে বাগানের ওদিকটায়—

কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রভাতকে কথাটা বোঝাতে পারলাম না। তার হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠছিল, চোখ লাল হচ্ছিল। যেন এবার সত্যি দমে গেলাম আমি। কথা বলতে কষ্ট হয়। গলা পরিষ্কার করতে অল্প একটু কেশে নিলাম। তারপর মেকি হাসি ঠোঁটের আগায় বুলিয়ে ক্ষীণ গলায় বললাম, 'আর একটু চা খাও।'

'কেন, কেবল চা কেন!' বিশ্রী একটা ভাঙ্গ দেখা গেল প্রভাতের চর্বি থলো-থলো থুতনিতে। ওটা যে তার হাসি বুঝতে এক সেকেণ্ড দেরী হল না আমার। চোখ লাল করে হাতের মুঠি পাকিয়ে মানুষ যখন হাসে তখন তার কী অর্থ দাঁড়ায়? শিকার লক্ষ্য করে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়ে শিকারী সময় সময় হাসে বৈকি। 'তোমার ঘরের আলমারীর তাকে এখন বোতল সাজানো থাকে না?' মুখ না, চোখ দিয়ে প্রভাত কথা বলল। তার নীরব প্রশ্ন আমার মর্মে বিঁধল। আমার যৌবনের উচ্ছৃংখলতা সে খুঁচিয়ে বার করতে চাইছে। অথচ কুড়ি বছরের ওপর আমি মদ ছেড়ে দিয়েছি। প্রাজ্ঞ প্রবীণ অধ্যাপক অতীতের অসংযমের চিত্র দেখতে চায় না। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। প্রভাত গলার শব্দ করে হেসে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে।

'কেবল চা খেয়ে নেশা হয় না ব্রাদার।'

এই প্রথম আমার পাকা ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল, হাতের মুঠি শক্ত হল, চোখের রং লাল হল।

আমার চোখের ভাষা প্রভাত বুঝতে পারছে না? নিশ্চয় পারছে।

অতীতের অসংযম মনে পড়ে ঢাকুরিয়ার এক প্রতিষ্ঠাবান বিত্তশালী প্রবীণ ব্যারিস্টার কেমন শিউরে উঠছে লক্ষ্য করে পুলকিত হই। আঘাত পেলে মানুষ প্রত্যাঘাত করে। বন্দুকের ঘোড়া টিপবার আগে নিষ্ঠুর শিকারী যেভাবে হাসে আমার ঠোঁটেও সেরকম একটা হাসি ঝুলছিল।

'তোমার বরানগরের রক্ষিতা কি বুড়িয়ে গেছে—আর নেশা ধরাতে পারছে না? বড় যে আজ অন্য নেশা খুঁজছ প্রভাত?'

'চুপ চুপ!' প্রভাতের চোখ ধমকে উঠল। 'আমারটা আমার মধ্যেই রয়ে গেছে—কিন্তু তোমার নেশা তোমার সন্তানকে পেয়েছে। তোমার মদের রক্ত ওর ভিতরে কাজ করছে, তাই না ও মাতাল হয়ে—'

'চুপ চুপ!' আমার চোখ নীরব রইল না। 'ব্যারিস্টার কিনা, তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করতে তোমার জুড়ি নেই।' আমার রক্তবর্ণ চোখ ধমকের স্বরে বলল, 'নারী-মাংসের ওপর

তোমার চিরদিন লোভ, আমি তো জানি, তুমি আমার বন্ধু; সেই লোভী রক্ত নিয়ে তোমার সন্তান বড় হয়েছে—তাই না—'

প্রভাতের চোখ আর কিছু বলছে না। আমার চোখ হঠাৎ কথা বলা বন্ধ করল। যেন এইটুকুন যথেষ্ট। ঠোঁট না খুলে, জিভ না নেড়ে আমরা পরস্পরকে কঠিন আঘাত করলাম। এই বয়সে। প্রভাতের ষাট আমার ঊনষাট। ছোটবেলা দুজনে হাত চালিয়েছি পা চালিয়েছি—দরকার মত দাঁত নখ ব্যবহার করেছি। কিন্তু এখন শুধু একে অন্যের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে, নীরব থেকে, দরকার মত লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে ঝগড়া করা ছাড়া উপায় কি। অথচ প্রভাত গোড়ায় সেটা বুঝতে পারেনি। ঝড়ো হাওয়া হয়ে সে ঘরে ঢুকেছিল। বজ্রমুষ্টি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদিও পরক্ষণেই তা শিথিল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি বটে বুকের ভিতর গরম রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আসলে তা না। ওটা সংস্কার। ক্রুদ্ধ হলেও কতটা ক্রুদ্ধ হওয়া চলে এই বয়সে? আমরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছি; রক্ত জমে এসেছে। বুঝলে প্রভাত। তার মুখের ওপর নিঃশব্দ দৃষ্টি বুলিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করি।

কিন্তু সে বোঝে না। শিশুর মত চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ায়। আমার দিকে তাকাতে ঘৃণাবোধ করছে। সরাসরি দেয়ালের কাছে সরে যায়। ঝুলানো র‍্যাকেট দুটো হুক থেকে টেনে নেয়। দুহাতে দুটো র‍্যাকেট শক্ত করে ধরে শূন্যে নাড়াচাড়া করে। যেন মনে মনে সে সাটলকক্ ছোড়াছুড়ি করে। হাসি। যদি তোমার বয়স কুড়ি থাকত তো দুটোই নিজের কাছে না রেখে একটা আমার হাতে তুলে দিতে, প্রভাত; বলতে, চলো চলো, কী সুন্দর বাইয়েটা—চমৎকার ঘাসের জমির ওধারে ফুল ফুটেছে—হাওয়াটা অদ্ভুত। বলতে, চলো—নীচে আমরা খেলা করব আর চাঁপার গন্ধে দুজনের বুক ভরে উঠবে, নেশা লাগবে।

চমকে ওঠলাম। মনে মনে কথা বলা থেমে গেল। কেন না প্রভাত হাতের র‍্যাকেট দুটো এত জোরে ছুঁড়ে মেরেছে যে ওধারে আমার ড্রেসিং-টেবিলের গায়ে ছিটকে পড়ে আয়নাটা ভেঙে দিল। লাভ হল কিছু? প্রভাতের মুখ দেখি। ফাটল ধরা আরসির বুকে তার বাঁকাচোরা মুখটাকে শয়তানের মুখের মতন দেখায়। অথচ এমনি সে সুপুরুষ। ক্রোধ মানুষকে কত নীচে টেনে নেয় ভাঙা আরসির ছবি তার প্রমাণ। প্রভাতকে অনুকম্পা করি। যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে সে পায়চারি করে। একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মড়ুড় শব্দ করে গুঁড়িয়ে গেল। কিছু একটা চিন্তা করা শেষ করে সে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়।

'নীচে খেলাধুলো সেরে ওরা ওপরে উঠে আসত, এখানে?'

'ওঘরে। পাশের ঘরে। এটা আমার বসবার কামরা দেখছ না?'

প্রভাত ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর পা টিপে টিপে এগোয়। যেমন শিকারের সম্ভাবিত আস্তানার দিকে শিকারী এগোয়। উত্তেজনা কৌতূহল ঘৃণা লোভ আশঙ্কা আকাঙ্ক্ষার ছবি যদি কেউ একসঙ্গে দেখতে চায় তো প্রভাতকে দেখুক। এই মুহূর্তে। সে যেমন স্থূল দেহটা টেনে টেনে পিঠটা একটু কুঁজো করে রেখে গলাটা ঝুলিয়ে দিয়ে মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত করতে করতে পাশের কামরার দিকে চলেছে। আর একটা গ্লাসের টুকরো তার জুতোর চাপে কুড়মড়ুড় শব্দ করে ভাঙে। প্রভাত শুনল না। আমি শুনছি। তার দৃষ্টি তার মন ওঘরে। বাঁ-হাতে পর্দা টানছে ডান হাতে দরজার কবাট ঠেলছে। বেশি জোরে ঠেলতে হয় না। ভেজানো ছিল। আস্তে ধাক্কা দিতে পাল্লা ফাঁক হয়ে যায়। কি

দেখছে সে? চর্বির খাজ পড়া কাঁধ দুটো একত্র জমে গিয়ে একটা উ'ই ঢিপির চেহারা ধরেছে। পিঠটাকে ঢোলের মতন মনে হয়। প্রভাতের সামনের দিকে যদিও দু চারটা চুল আছে মাথার পিছনটায় মস্ত বড় টাক। ওঘরের জানলাগুলো বন্ধ। ভিতরটা অন্ধকার। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপছে কি সে। বুঝতে পারছে না কোথায় সুইচ বোর্ড। অন্ধকারে চোখ মেলে দিয়ে সে শূন্য ঘরে কি কি তথ্য প্রমাণ মেলে তাই খুঁজতে ব্যস্ত। হয়তো একটা দুটো জানলা খুলে দিলে, কি আলোটা জ্বাললে সব পরিষ্কার দেখা যেত। চিন্তাটা তার মাথায়ই আসছে না। আসতে পারে না। মাথায় অন্য সব চিন্তা ঠেসে রেখে সে এটা ওটা হাতড়াচ্ছে। ওটা কি? জিনিসটা টেনে এনে প্রভাত দরজার কাছে ছুটে আসে। চুলের রীবন। লাল টুকটুকে রং। আমি দূর থেকে দেখলাম; এখানে চেয়ারে বসে থেকে ওখানে দৃষ্টি পাঠিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলাম এই মুহূর্তে সে কী কাজটা করল! জুতো দিয়ে পিষসে চুলের ফিতাটা। নুয়ে আবার সেটা হাতে তুলে নেয়। নাকের কাছে গিয়ে গন্ধ শোঁকে। তারপর সেটা একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। যেন আর একটা কিছুর জন্য সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়েছে। ওটা কি? প্রভাত দরজার কাছে—আলোর কাছে ছুটে এল। মূল্যবান কিছু না। ছোট একটা অ্যাসট্রে। প্রভাতের হাতের নাড়াচাড়ায় কিছু ছাই ঝরে পড়ল—কিছু পোড়া তামাকের গুঁড়া। এবার নিশ্বাস বন্ধ করে আমি তাকিয়ে রইলাম। ওটা আর তার জুতোর তলায় গেল না। যত্ন করে সে পকেটে পুরল। যেন আর কিছু জানবার দরকার নেই দেখবার দরকার নেই ওঘরে। আস্তে বেরিয়ে এল প্রভাত।

'কতক্ষণ থাকত ওরা ওঘরে?'

'অনেকক্ষণ।'

'রোজ?'

'রোজ।'

'কবে থেকে এটা হচ্ছিল?'

'শীতের শুরু থেকে—তখনও গাছে গাছে নতুন পাতা কুঁড়ি ফুল দেখা দিতে আরম্ভ করেনি।'

'আবার কাব্য।' প্রভাত বিড়বিড় করে উঠল। 'তো তুমি কিছু বললে না, তুমি কি দেখতে না?'

কী উত্তর দেব! উত্তর তৈরী করে রাখিনি। অসহায় চোখে তার কুঞ্চিত অপ্রসন্ন ভ্রূযুগল দেখতে দেখতে দুবার ঢোক গিললাম। হ্যাঁ, ছিল উত্তর। আমি বলতে পারতাম প্রভাতকে—যখন ওদিকে চোখ গেল আমার, যখন টের পেলাম তখন আর বলার সময় ছিল না। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসে গেছে। তখন কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভায় আকাশ লাল হয়ে গেছে, মধুলোভী ভোমরাদের আনাগোনার বিরাম ছিল না; ওদিকে আম জাম কাঁঠাল জামরুলের গুটি দেখা দিয়েছে গাছে গাছে। ফলের সম্ভাবনায় ডাল পাতাগুলি কাঁপছিল। সেই উৎসবের দিনে ওদের দুজনকে কিছু বলতে আমি সাহস পাইনি।

আমাকে নীরব দেখে প্রভাত দাঁতে দাঁত ঘষল। তার বুঝি মনে নেই বাঁধানো দাঁত—বেশি জবরদস্তি করতে গেলে ছিটকে মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। যেন বন্ধুকে সাবধান করে দিতে আমি ঠোঁট আলগা করতে যাব, এমন সময়, প্রভাত কপালের ঘাম না রীতিমত আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে রুমাল দিয়ে চোখের কোণা মুছল। কাঁদছে? আর তার কণ্ঠস্বর বিকৃত বীভৎস হয়ে আমার কানের পর্দা আঘাত করল।

'কত টাকা খরচ করেছি আমি ওর জন্য, এই সেপ্টেম্বরে ও বিলেত যেত, কত সম্ভাবনা ছিল—অকৃতজ্ঞ—' প্রভাত থরথর করে কাঁপছিল। টেবিলের ওপর দুহাতের ভিতর মুখ গুঁজল। আমার ইচ্ছা করছিল ঐ অবস্থায় তার চেহারা দেখি চোখ দেখি। ক্রোধের আগুন তাহলে এবার সত্যি নিভতে শুরু করেছে! এখন সে বেদনাহত। এখন হয়তো বোঝাতে গেলে প্রভাত কবিতা বুঝবে কাব্য শুনবে। বাইরে আকাশের দিকে চোখ গেল আমার। শিউরে ওঠলাম। বিশাল কালো মেঘ আমার লনের ওপর থমকে দাঁড়িয়েছে। গুরগুর শব্দ হচ্ছে।

'প্রভাত!' ফিসফিস করে ডাকলাম।

এত মৃদু ডাক তার কানে গেল না। বরং তার ক্রন্দনজড়িত মৃদু স্বরটা আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আর বিকৃত মনে হচ্ছে না কথাগুলি। যেন হৃদ্‌পিণ্ড গলে গলে চোখের জলে ধুয়ে টেবিলের ওপর ঝরে পড়ছে : 'আমি কোথাও চলে যাব। বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি কিছুই ধরে রাখতে পারবে না আমাকে আর—সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাব।'

ইচ্ছা করছিল শব্দ করে হেসে উঠি; ইচ্ছা করছিল দুহাতে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরি। তা পারলাম না যদিও। টেবিলের ওপর ঝুঁকে গাঢ় গলায় বললাম, 'ঐ সান্ত্বনা ঐ সন্তোষ নিয়ে আমি বুক বেঁধে আছি, প্রভাত। আমার কেউ নয়, আমি কারওর নই। এটা ভাল। না হলে আমিও কি কম যত্ন করেছি ওর। ডায়োসেশানে এবার থার্ড ইয়ার চলছিল—এদিকে গানের মাস্টার, নাচের জন্য মাস্টার, কিন্তু কিছুই তো ভাল লাগল না তার।'

'কিছুই ভাল লাগল না তার।' আমার কথাগুলি অনুকরণ করল প্রভাত। টেবিল থেকে মুখ তুলল। ক্লান্ত বিধ্বস্ত চেহারা। উত্তেজনা নিয়ে পাশের কামরায় ঢোকা, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মাত্র এই ক-মিনিটের মধ্যে ভেঙে চুরে দুমরে একেবারে অন্যরকম হয়ে গল মানুষটা। ওই প্রায়ান্ধকার কামরায় এমন আর কি চোখে পড়ল তার যে আর চোখ লাল করতে পারছে না সে, হাতের মুঠি শক্ত করতে পারছে না।

অল্প শব্দ করে হাসলাম।

'আমার আমার করি বটে আমরা, কিন্তু কিছুই আমাদের নয়—কেউ আমাদের নয়।'

প্রভাত ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। আমাকে সে এখন পুরোপুরি সমর্থন করছে। গাঢ় নিশ্বাস ফেলে সে বাইরেটা দেখল। 'অসহ্য গুমট।' অস্ফুটে বলল সে।

আমি তার সুযোগ গ্রহণ করলাম।

'এখনি বৃষ্টি হবে। হাওয়া বন্ধ হয়ে আছে। চলো বাইরে, নিচে—'

প্রভাত ঘাড় কাত করে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বন্ধুর হাত ধরি। বোধ করি এই প্রথম আন্তরিকতার স্পর্শ অনুভব করতে পেরেছে সে। তার চোখে কৃতজ্ঞতা। অবাক হলাম। রক্তবর্ণ চক্ষু মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে কৃতজ্ঞতায় নরম হয়ে এল না কিন্তু; সজল মেঘের রং কিশোরীর চোখের রং ফিরে এসেছে তার চোখে। ষাট বছরের প্রভাতের চোখে। তেমনি ঠাণ্ডা নিষ্কলুষ।

'আমিও তাই ভাবছি। এখন ভাবছি, আর রাগ করব না, দুঃখ করব না। কিছুই যখন সে নিতে চাইলে না, নিলে না; আমার কোনো চাওয়া যখন ওর ভাল লাগল না তখন আর—'

সিঁড়ির পথে সে বলছিল।

'না, আমার কোনো চাওয়া ও চায়নি।' প্রভাতকে অনুকরণ করে আমি মৃদু গলায়

বললাম, 'ওর ভাল লাগার কাছে আমার সব ইচ্ছা সাধ গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেছে, কাজেই দুঃখ করব কার জন্য!'

নিচের পোর্টিকো পার হয়ে দু বন্ধু হাত ধরাধরি করে নরম ঘাসের বুকে পা রাখলাম।

'আমি কি জানতাম।' প্রভাতকে নিয়ে আমি তখন বাগানের কাছে চলে গেছি। আস্তে আস্তে যেন অনেকটা নিজের মনে সে বলছিল, 'কলেজ ছুটি হতে সে এখানে ছুটে এসেছে খেলতে। ঐ পর্যন্ত জানা ছিল। কিন্তু ওই খেলা যে—'

তার হাতে মৃদু চাপ দিলাম। যেন হঠাৎ চুপ করতে ইসারা করলাম। দুটো বড় বড় রুপোলি ফোঁটা পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ল। 'বৃষ্টি হবে—বৃষ্টি আরম্ভ হল। এখন আমরা আরো শান্তি পাব, প্রভাত।' চোখ তুলে প্রভাত আকাশ দেখল, কদম আর দেবদারুর সবুজ নিবিড় পত্রগুচ্ছ দেখল। আমি পরিষ্কার উপলব্ধি করছিলাম আসন্ন বৃষ্টির মুহূর্তে আমার বাগানের রূপ দেখে প্রভাত মুগ্ধ হয়েছে। যা তখন ওপরের চার দেয়ালের মধ্যে থেকে তাকে বোঝাতে কষ্ট হচ্ছিল। 'বুঝলে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা গণ্ডীর ভিতর থাকি, কোথাও আবদ্ধ থাকি ততক্ষণ অশান্তি। যেদিন আমি এটা উপলব্ধি করলাম সেদিন বাইরে চোখ পাঠিয়ে দিয়ে চুপ করে রইলাম। আজ তুমি সন্ন্যাসী হতে চাইছ বন্ধনমুক্তি চাইছ, আজ তোমার আকাশ মাটি গাছ ফুল ঘাস—ওই ওখানে ঝোপের আড়ালে তারস্বরে ব্যাং ডাকছে তা-ও ভাল লাগবে।' একটু চুপ থেকে পরে আস্তে আস্তে বললাম, 'আর তখন এই ভাল-লাগার মন নিয়ে ভালবাসার হৃদয় নিয়ে তুমি সবাইকে ক্ষমা করতে পার, সব কিছু সহ্য করতে পার।'

প্রভাত আমার কথা বুঝল। বুঝল কেন সেদিন কৃষ্ণচূড়ার আগুনে আমি দু চোখ পুড়িয়েছিলাম। কেন ভোমরার গুনগুন আর পাখির কিচিরমিচির শুনতে কান পেতে রেখেছিলাম। কি দেখব না, কি শুনব না বলে।

'আমার কিছু না কেউ না—আবার সবাই আমার সব কিছু আমার।' সুন্দর করে হেসে পায়ের কাছের নরম রজনীগন্ধার ডাঁটার ওপর আঙুল রাখলাম। 'দেখ, সবুজের বুকে শাদা কুঁড়ি ঘুমিয়ে ছিল। দু ফোঁটা জল পড়তে চোখ মেলছে। আমার ফুল—আমার বাগানের রজনীগন্ধা। দুদিন পর এসো। তখন ঈর্ষা করবে। ঘনবর্ষা শুরু হবে, আর সতেজ উদ্যত লাবণ্য নিয়ে সবুজ ডাঁটারা রানীর মতো হেলে দুলে তোমায় জানিয়ে দেবে এ-বাগানের মালিক কে, কে এই সৌভাগ্যবান পুরুষ।'

ড্যাবডাবে চোখে প্রভাত আমাকে দেখল। একটু হাসলও। সে হাসুক, তার মন ঝরঝরে হয়ে যাক এই তো চাইছিলাম। বললাম, 'কিন্তু কদিন প্রভাত, কদিন ওরা আমার থাকবে? কৃষ্ণচূড়ারা কদিন আমার বাড়ির সামনেটা আলো করে ছিল? যেদিন বর্ষণ থামবে, একবার এসে উঁকি দিও। তোমার কান্না পাবে বাগানের চেহারা দেখে। হয়তো সেদিন আমাকে মনে মনে অনুকম্পা করবে। কিন্তু সত্যি কি আমি কাঁদব প্রভাত, যা রইল না মরে গেল তার জন্য? না, সেদিন নতুন করে আমাকে দেখতে ভালবাসতে আর একজন আসছে। হিমের স্পর্শ পেয়ে শিউলিরা চোখ খুলছে।'

'ঋতুর পর ঋতু তাই তো চলছে। একটি আসে আর একটি যায়।' প্রভাত দার্শনিকের মতো গলার স্বর করল। 'ফুল ফল—'

'পশু পক্ষী মানুষ—সব।' গলার স্বর চড়িয়ে দিলাম। জোরে বৃষ্টি নেমেছে। প্রচণ্ড

শব্দ হচ্ছে। জাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দুজন। জলের ছাটে ভিজে যাচ্ছি। তবু ভাল লাগছিল। এত বড় একটা লাল পিঁপড়া প্রভাতের জামার হাতায় বেয়ে ওঠে। প্রভাত আঙুলের টোকা দিয়ে অনায়াসে ওটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু ফেলছে না। যেন কষ্ট হচ্ছে তার। কত সহিষ্ণু কত নরম হয়ে গেছে ও এই আধ ঘণ্টার মধ্যে দেখে ভাল লাগল। আর আমি বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গলা বড় করে বললাম, 'ঋতুতে ঋতুতে গাছের রূপ বদলায় প্রকৃতির রং বদলায় মানুষের স্বভাব বদলায়। হয় তার ইচ্ছা, তার চাওয়া, তার অভিরুচির রং। কোনটা থাকল বলে আমরা হাসব কোনটা থাকল না বলে আমরা কাঁদব তুমি বলতে পার কি? কেননা তোমার ছেলের কোনোটাই তোমার না, আবার সবটাই তোমার—তেমনি আমার মেয়ের। ঠিক ফুল ফোটার মতন, ফুলের মরে যাওয়ার মতন। তাই তো ওরা মাঠের খেলা ছেড়ে যখন চুপ করে গাছের নীচের ওই বেঞ্চটায় বসে থাকতে আরম্ভ করল আমি অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছি; যখন বেঞ্চি ছেড়ে আমার ঘরের পাশের সেই ছোট্ট কামরায় আশ্রয় নিল আমি চুপ করে রইলাম। আমি হাসিও নি কাঁদিও নি।'

প্রভাত নীরব। বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রং-ফেরা দেখছে উল্লাস দেখছে। যেন একটু পর সে আমার কথায় ফিরে এল।

'মানে সারা বসন্তটা ওরা মাঠে খেলাধুলা করল, গ্রীষ্মের শুরু থেকে ওই কামরায় ঢুকল?'

'তাই।'

'আর বর্ষা আসছে এমন সময় তোমার লনেও রইল না ওরা, ছোট্ট ঘরেও রইল না।'

'না।' সংক্ষেপে উত্তর সারলাম। প্রভাতের মুখের দিকে তাকাতে আবার ভয় করে। যেন তার গলার স্বর আবার ভাঙছে টের পাই। 'এসো, ইদিকে—' প্রভাতের হাত ধরে আস্তে টানলাম। 'আমার মাধবীবনের কী চেহারা হয়েছে দেখবে।'

'মাধবী মরবে অপরাজিতা জাগবে।' যেন এই প্রথম একটা কবিতার লাইন বলতে চেষ্টা করল প্রভাত। খুশি হয়ে তার হাত ধরে লম্বা লম্বা পা ফেলি। বৃষ্টির জোর হঠাৎ কমে গেছে। ঝিঁঝি ডাকছে। মাথার ওপর পাখার ঝাপটা শুনলাম। একটা পাখি গায়ের জল ঝাড়ছিল। মাধবীবন দেখা শেষ করে আর একটু এগোই দুজন। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াই। প্রভাত ও আমার দৃষ্টি এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। ওপাশে ঘন কেয়া-ঝোপ। লম্বা ডাঁটার মতো শাদা ফুলটা হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। টুপটাপ জল ঝরছে পাপড়ি থেকে। কিন্তু আমরা তা দেখিনি—সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই। দেখছিলাম এ পাশটা। জমির একটু অংশ। যেন কাল রাত্রে মাটি খোঁড়া হয়েছিল—রাত্রে বা বিকেলে বা কাল সকালে। নতুন মাটির চিহ্ন। গর্ত খুঁড়ে আবার মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসানো হয়েছে। বৃষ্টির তোড়ে ঘাস সরে গেছে, মাটি ফেটে গেছে। ভিজা মাটি ফুঁড়ে ফুলের কলি আকাশের মেঘ দেখছে—ভুঁই-চাঁপার কলি; একটা না পাঁচটা, আমরা রুদ্ধশ্বাসে গুণে শেষ করলাম। প্রভাত কাদার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আমিও। যেন শেয়ালের মতো মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে প্রভাত ওটাকে টেনে বার করল। আশ্চর্য, রাগ করল না সে, কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে না। আমার বুক দুরদুর করছিল যদিও আশঙ্কায়। তখন সে ব্যাডমিণ্টনের র‍্যাকেট দুটো ছুঁড়ে মেরেছে। আমার ঘরের ড্রেসিং-আয়না ভেঙেছে। উন্মত্ত হয়ে চুলের রীবন জুতো দিয়ে পিষেছে। এখন?

প্রভাতের চোখে জল এল।

আমিও চোখ মুছলাম। একটু পর, যেন এই নিয়ে তিনবার নবজাত ঘুমন্ত শিশুর কপালে ঠোঁট ছুঁইয়ে প্রভাত আবার আস্তে কোল থেকে ওটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ওপরে মাটি চাপা দেয়। ঘাসের চাপড়াগুলি সুন্দর করে বসিয়ে দেয়। তারপর সে উঠে দাঁড়ায়। আমিও। বৃষ্টিটা একেবারে ধরে গেছে। কেয়াঝোপ পিছনে রেখে মাধবীবন পার হয়ে দুজন আবার সবুজ ঝকঝকে ঘাসের ওপর চলে আসি।

'এটা করার দরকার ছিল কি?' প্রভাত আমার চোখ দেখছিল না। মেঘের ফাঁকে রোদ চিকিয়ে উঠেছে তাই দেখছিল।

'হয়তো ভয়ে—লজ্জায়।' আমি আস্তে বললাম।

'তারপর পালিয়ে গেল দুটিতে।' তেমনি আকাশ মুখ করে সোনাগলা রোদ চোখে নিয়ে প্রভাত বলছিল। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তার মুখ দেখছিলাম। কেবল কি অনুকম্পা? যেন আরো অনেক কিছু দেখলাম প্রভাতের চকচকে চোখ দুটোর মধ্যে। ফুল শুকিয়ে যাওয়ার ব্যথা—ফুলের শুকিয়ে একটু একটু করে সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ। আমি তাই আশা করছিলাম।

বিশ্বজনীন ঐক্য

আর্ণল্ড টোয়েনবি

মানুষের ইতিহাসে বর্তমান কালে একটি নূতন আন্দোলন জন্ম নিয়েছে। পৃথিবীর মানুষ একটি অভিন্ন পরিবারের মতো ঐক্যবদ্ধ জীবন রচনার জন্য আজ উদ্যোগী হয়েছে। এই উদ্যোগের পিছনে উচ্চাশার অভিলাষ আছে, কিন্তু তেমনি আছে অনিবার্যতারও তাগিদ। এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে নানা দেশ থেকে নানা উপকরণের সম্ভার এনে দিতে হবে। সেই দানসম্ভার পশ্চিম থেকে কি আসতে পারে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ তার উল্লেখ করা যায়। ভবিষ্যত বিশ্বজনীন সমাজকে পাশ্চাত্য হয়ত দেবে তার যন্ত্রবিদ্যার সাংগঠনিক সহায়তা, সেই সহায়তা ছাড়া এমন অভূতপূর্ব বিশাল বিশ্বপরিবারকে একত্র সংবদ্ধ এবং সংরক্ষণ করা অসম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে তিনশত বৎসর পূর্বে যে উদারনৈতিক ভাবধারার আবির্ভাব স্পষ্ট হতে আরম্ভ করেছিল, সেই ভাবধারা থেকেই বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম গ্রহণ করে। ভবিষ্যত বিশ্বসমাজকে পশ্চিম যে যন্ত্রবিদ্যার সম্ভার দান করবে, সে সম্ভার এই বিজ্ঞানবুদ্ধিরই ফল। তেমনি আমি মনে করি, এই বিশ্বসমাজের জন্য ভারতবর্ষের কাছ থেকে দানস্বরূপ পাওয়া যাবে তার প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তি এবং উদার মানসিকতা। পশ্চিমের বিশিষ্ট প্রচেষ্টার ফলে বিশ্বজনীন ঐক্যের অভিমুখে মানবজাতি আজ এক নূতন যুগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। সেই নূতন যুগের মানবজাতির জন্য ভারতবর্ষের এই দানও অমূল্য সম্পদরূপেই স্বীকৃত হবে। কাব্যিক ভাষায় বলা যায় যে, পশ্চিমের বিজ্ঞানবুদ্ধি 'ব্যবধান বিলোপ করেছে'। কিন্তু সেইসঙ্গে বিজ্ঞানবুদ্ধি আজ মানুষের হাতে এমন অস্ত্রও তুলে দিয়েছে, যার দ্বারা মানবজাতিকেই বিলুপ্ত করা সম্ভব। মানুষের হাতে এমন বিধ্বংসী অস্ত্রও আর কখনো আসেনি। এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র হাতে নিয়ে আমরা মানব-জাতির ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলি আজ পরস্পরের মুখোমুখি-নিশানায় এসে দাঁড়িয়েছি। যদিও তারা অভিন্ন বিশ্বমানবতারই অন্তর্ভুক্ত, তবু মানবজাতির এই খণ্ড খণ্ড অংশগুলি আজও পরস্পরের কাছে বহুলাংশে অচেনাই রয়ে গেছে। কিন্তু অচেনার অধ্যায়েই এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক আজ দেখা দিল। একমাত্র জীবাণু ছাড়া এই গ্রহের বাকি সমস্ত মানবেতর প্রাণীর উপরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা একদা প্যালিওলিথিক যুগের মধ্যভাগে চির-কালের জন্য অপরাজেয় প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। সেই সময় থেকে অদ্যাবধি মানুষ কখনো আর এতবড় প্রাণান্তক সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়নি। জীবাণুকেও মানুষ বর্তমান যুগে অনেকটা পরাভূত করে এনেছে। কিন্তু এই যুগেই মানুষ মানুষের সম্মুখে যে বিপদের মূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে, কোনো মানবেতর প্রাণী কখনো মানুষের সম্মুখে ততখানি ভয়ানকরূপে দেখা দেয়নি—কোনো হিংস্র শ্বাপদ, কোনো জীবাণু, কোনো ভাইরাসও নয়। মানুষ জীবাণুকে পরাভূত করেছে সত্য, কিন্তু এখনো নিজেকে করতে পারেনি। আর, নিজেকে সে আজ এমন অস্ত্রে সজ্জিত করেছে, যার তুলনায় হিংস্র শ্বাপদের কিংবা জীবাণুর ভয়াবহতাও অতি তুচ্ছ। এই মারাত্মক পরিস্থিতিতে তিতিক্ষার মনোভাব মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস ঐক্যবদ্ধ মানবজাতির সংগঠনে ভারতবর্ষের স্বধর্মোচিত দান তিতিক্ষার কথা আমাদের বংশধরগণ পূর্বালোচনার সময় স্বীকার করবেন।

পাশ্চাত্য এবং তার সম্ভাব্য দান সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে আমি আলোচনা করেছি। মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ করার পূর্বে পাশ্চাত্য সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলার আছে। আমি পাশ্চাত্যের আধুনিক উদারনীতিবাদের বিষয় উল্লেখ করেছি। পাশ্চাত্য তার এই অবদান সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গতভাবেই গর্ববোধ করতে পারে। কারণ, এই উদারনীতির ফলস্বরূপ আরও কিছু কিছু সুকীর্তি পাশ্চাত্য দেখিয়েছে। যেমন, আমার স্বদেশবাসীরা এরই বশবর্তী হয়ে অবশেষে ভারত শাসনের অধিকার পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষেরই নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের হাতে ভারত সরকারের ক্ষমতা সমর্পণ করে গেছেন। আজ যাদের কাছে এই ক্ষমতা সমর্পণ করা হল, তাঁরা পূর্বতন বৃটিশদের হাতে কারাদণ্ডও ভোগ করেছেন। আমি পাশ্চাত্যের এই উদারনীতিবাদের জন্য গর্ববোধ করি। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই দুই দেশের তিক্ত সম্পর্কের অধ্যায় যে মধুরভাবে শেষ হয়েছে তার কৃতিত্ব উভয়েরই। বর্তমানের সংকটগ্রস্ত প্রজন্মে মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে ভারতবর্ষের যে ঘৃণাবিমুক্ত ভাবধারা পরিপূর্ণ সফলতায় বিধৃত হয়েছে, তারই সঙ্গে পশ্চিমের উদারনীতিবাদের সম্মিলনের ফলেই এ সম্ভব হল। আমাদের উদারনীতিবাদ ভারতবর্ষের গান্ধীবাদের সঙ্গে সঙ্গীত ধ্বনির মতো মিলিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার মধ্যেও পশ্চিমের উদারনীতিবাদের প্রতি ভারতবর্ষের অনুরাগ স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমী প্রথায় সংবিধানের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পরিষদীয় নীতি অনুসারে আত্মশাসনের পন্থতি ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে।

এই পরিষদীয় গণতন্ত্রের মধ্যেই পাশ্চাত্য তার উদারনীতিবাদের স্বধর্মকে রাজনৈতিক অভিব্যক্তি দিয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষকে এই সত্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, উদারনীতিবাদ কখনোই কেবলমাত্র পশ্চিমের একক জীবনদর্শন ছিল না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের Wars of Religion-এর ভিতর দিয়ে পাশ্চাত্য জগতে যে নৃশংস গৃহযুদ্ধের পালা আরম্ভ হয়েছিল, তার জিঘাংসা ও ঘৃণার মনোবৃত্তিরই প্রতিক্রিয়ারূপে সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিমের উদারনীতিবাদ জন্মগ্রহণ করে। আর, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই উদারনীতিবাদের বিরুদ্ধাচরণ এখনো স্তব্ধ হয়নি। পশ্চিমে আমার সমসাময়িক যাঁরা তাঁরা নৃশংস গৃহযুদ্ধের আরও একটি পালার ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেছেন—সেই দুইটি যুদ্ধই ইউরোপে আরম্ভ হয়ে বিধ্বংসী বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশে উদারনীতিবাদের বিরোধীরা এই দুই যুদ্ধেই উদারনীতিবাদকে প্রায় মৃত্যুর কিনারায় নিয়ে এসেছিলেন। কাজেই দেবতা জেনাসের মতোই পাশ্চাত্য দ্বিমুখী, তার অন্তরের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ ভাবধারা এবং মূল্যবোধের যে সংঘাত চলছে, তারই প্রতিফলন এই বিপরীত আননে। এই সত্য উদারনৈতিক পশ্চিমীদের মধ্যে বেদনামিশ্রিত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। আমাদের পক্ষে এই সত্য স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু আমি বুঝি যে, পাশ্চাত্য-বহির্ভূত বাদবাকি মানবজাতির কাছে এই সত্য অতি সুস্পষ্ট। পশ্চিমের এই দুই বিপরীত মূর্তির উভয় দিকই ইহুদিদের কাছে বহুদিনের পরিচিত, অধুনা এর পরিচয় এশিয়া এবং আফ্রিকার মানুষেরাও পেয়েছে। ভারতবাসীরা এ যুগে পশ্চিমের ইতিহাসের যে অধ্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন, আমি যে অধ্যায়ের ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করলাম, তারই অভিজ্ঞতা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, উদারনীতিবাদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন স্বাধীনতার বেলায় তেমনি এর বেলায়ও শাশ্বত প্রহরার দ্বারাই এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। কারণ এরও দুরারাধ্য লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা।

এবার আমার মূল বক্তব্যের অবতারণায় আসা যাক। বিশ্বব্যাপী ঐক্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি প্রথমে আলোচনা করব।

বর্তমান মুহূর্তে এই ঐক্যের আবশ্যকতা যে আমরা এত তীব্রভাবে বোধ করছি, তার কারণ একাধারে যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি আবার বৈশিষ্ট্যহীন। এই কথাটাই স্পষ্টভাবে একটি সূত্রাকারে বর্ণনা করা হয়েছে : হয় বিশ্ব অখণ্ড থাকবে, নতুবা বিশ্বের অস্তিত্বই থাকবে না। আজিকার বিশ্বে প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নর-নারীর কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমান পারমাণবিক যুগে আমরা যদি যুদ্ধকে বিলুপ্ত করতে না পারি, যুদ্ধই আমাদের বিলুপ্ত করে দেবে। এমন একটা বহুকথিত উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে সংকোচবোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু যতদিন যুদ্ধ একটি স্বীকৃত প্রথারূপে গণ্য হচ্ছে এবং যতদিন এই প্রথা অবলম্বনে মানুষ ইচ্ছুক থাকছে, ততদিন এবিষয়ে আলোচনা না করেও কোনো উপায় নেই।

যুদ্ধ সম্পর্কিত আমাদের বর্তমান সংকট মানব ইতিহাসে কোনো অপরিচিত ঘটনা নয়। যতদিন কোনো সামাজিক অন্যায় ধ্বংসের কারণ স্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায় ততদিন সামাজিক অন্যায়কে মানুষ বরদাস্ত করতেই অভ্যস্ত, কারণ মানুষের জীবন তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। যেমন দাসত্বপ্রথার বেলায় ঘটেছে, মানবজাতি হাজার হাজার বৎসর এই অন্যায় বরদাস্ত করেছিল। কোনো অন্যায় প্রথা যতই কুৎসিৎ হোক, সে যদি ধ্বংসোন্মুখ না হয় তাহলে মানুষ স্বভাবজনিত অভ্যস্ততার বশেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আর, অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য সে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, অন্যায়টা যখন প্রাচীন তখন নিশ্চয় তা মানুষের জন্মগত পাপ এবং তাই যদি হয় তাহলে এর প্রতিকারও নিশ্চয়ই মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু একথা সুবিদিত যে, মানুষের ইতিবৃত্ত কখনোই নিশ্চল নয়। প্রচলন এবং অভ্যস্ততার দরুণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিত্রপটে কতকগুলি প্রথা স্থায়ী বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু আজ হোক কাল হোক, একদিন না একদিন সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জাগরণের ন্যায় অন্তস্তল থেকে অভ্যুত্থান দেখা দেয়। যে প্রচেষ্টাকে মানুষ এতকাল নিশ্চিত অসম্ভব বলে বাতিল করে এসেছে, এই ধরনের একটা অভ্যুত্থানের পর সেই প্রচেষ্টাই মানুষ বিলম্বে আরম্ভ করতে বাধ্য হয়। অথচ কাল-বিলম্বের দরুন তখন সেই চেষ্টা সময়ের প্রতিকূল হয়ে পড়ে। যে অন্যায় এতকাল জন্মগত বলে বিশ্বাস করে এসেছি তার মূলোচ্ছেদ করে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে তখন আমরা বাধ্য হই। একে আমরা নিশ্চিহ্ন করব, অথবা এর হাতে আমরা নিশ্চিহ্ন হবো—এই বিকল্প যখন উপস্থিত হয় তখন আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আর একে বিধিলিপি বলে বরদাস্ত করা যায় না। প্রতিকার অসাধ্য এই পূর্বতন বিশ্বাস আবার আমাদের যাতে পঙ্গু করে ফেলতে না পারে সেইজন্য প্রতিকারের চেষ্টায় তখন আমাদের নামতে হয়। যুদ্ধ সম্পর্কে আজ আমরা এই প্রকার অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছি।

এইরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া মানুষের নির্বোধ স্বভাবের ফল। এটা কেবল নির্বুদ্ধিতা নয়, নির্বোধ জেদও। শুধু তাই নয়, এই নির্বুদ্ধিতা মনুষ্য স্বভাবেরও অনুপযুক্ত। মনুষ্যত্বের অর্থই হচ্ছে তার পশ্চাদ্‌দৃষ্টি থাকবে এবং পশ্চাৎ দৃষ্টিকে সে দূরদৃষ্টিতে পরিণত করবে। খৃষ্টপূর্ব তিন হাজার বৎসর পূর্বে রণ দেবতা তাঁর প্রথম বৃহৎ মারণযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। বর্তমানে যেখানে ইরাক সেখানে আমাদের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন সুমেরিয় এবং আক্কাদীয় সভ্যতা ঐ সহস্রাব্দেই যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয়েছিল। তারপর থেকে এতদিন পর্যন্ত যদিও আমাদের কারিগরীবিদ্যার উন্নতি ক্রমাগত পারমাণবিক অস্ত্রের উদ্ভাবনের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, তথাপি বিগত এই চার হাজার বৎসর যাবৎ আমরা যুদ্ধের প্রথাকে

অব্যাহত থাকতে দিয়েছি। সতর্ক হওয়ার অবকাশ পেয়েছে আমরা চার হাজার বৎসর যাবৎ, কিন্তু একের পর এক সুযোগ আমরা অবহেলায় নষ্ট করেছি। বর্তমান দুর্দশার জন্য আর কেউ নয়, আমরা নিজেরাই দায়ী।

মানবিক ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা নিরাপদ নয়। কিন্তু তার চেয়েও বিপজ্জনক হচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করে থাকা। বাঁচতে হলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও অনুমান করতে হয়। আমার নিজের অনুমানের মূল্য কতটুকু জানিনে, কিন্তু আমার ধারণা যে, যুদ্ধের এই প্রাচীন প্রথাটির বিলোপসাধনে এবার আমরা সার্থক হতে চলেছি। ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ-সাধন যতটা দুরূহ হয়েছিল, এ চেষ্টা নিশ্চয়ই তার চেয়ে দুরূহতর হবে না। যুদ্ধের মতোই ক্রীতদাস প্রথাও বহু পুরাতন এবং আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। অতীতে একাধিকবার নিজেকে নিজের সৃষ্ট বিপদ থেকে মানুষ শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছে।

যুদ্ধের বিলোপ সাধন করতে হলে যতই বাঁজাকারে হোক, একটি অখণ্ড বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন করতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা প্রথম প্রয়োজন। বিশ্ব কর্তৃত্বমূলক যে সংস্থা আমরা স্থাপন করব, তার আরম্ভ হতে হবে এইখানে। যদি আমরা এই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হই, তারপরে কি এইখানেই আমাদের প্রচেষ্টা শেষ হয়ে যাবে? অবশ্যই নয়। চলার পথে মানুষের পক্ষে কখনোই বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব নয়। আমরা থামতে পারি না, কারণ একটা সমস্যার সমাধান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটার উৎপত্তি হবে। যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটা মানেই আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সম্মুখে এসে দাঁড়াব। অবশ্য এই সমস্যা নূতন নয়। যুদ্ধের সমস্যা কিংবা ক্রীতদাস প্রথার চেয়ে এ সমস্যা আরও অনেক পুরাতন। মানুষের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই দুইটিরও জন্ম হয়েছিল। মানুষের সংগঠন ক্ষমতা যতদিন সভ্যতার স্তরে না পৌঁচেছে ততদিন ক্রীতদাস প্রথার আবির্ভাবও সম্ভব ছিল না, যুদ্ধেরও না। অপর পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা মনুষ্যজাতির মতই সমান পুরাতন। বস্তুতঃ প্রাণের আবির্ভাব যতদিনের পুরাতন ঘটনা, এও ততদিনেরই পুরাতন। শুধু এইটুকুই এর নূতনত্ব যে, অধুনা এ সমস্যা মানুষের নিজের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, কাজেই আমরাও এর সম্বন্ধে সচেতন হতে বাধ্য হয়েছি।

মানবিক আদর্শ এবং চিন্তাধারা অনুযায়ী এই পৃথিবীতে জনসংখ্যার আকৃতি যতখানি হওয়া বাঞ্ছনীয় সেই অনুপাতে মনুষ্যজীবনকে নিয়মিত করার ক্ষমতা এতকাল মানুষের করায়ত্ত ছিল না। এই পৃথিবীতে যে-ই ভূমিষ্ঠ হোক, তার প্রত্যেককেই আমরা একটা পরম মূল্য দিয়ে থাকি। আমাদের কাছে সেই পুরুষ বা নারীর একটা ব্যক্তিত্ব আছে। যে ব্যক্তি সমষ্টি নিয়ে মনুষ্যজাতি গঠিত, স্বতন্ত্রভাবে তার প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ যদি সুস্থ জীবন যাপনের সুযোগ পায়, তবেই আমাদের কাছে মনুষ্যজাতিরও বাঁচার অর্থ কিংবা তাৎপর্য থাকে। মানুষের নিজের তৈরী মূল্যায়নমান অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের প্রাণই অমূল্য। যে সব প্রজাতির নিদর্শন অনায়াসে নষ্ট করা যায়, তার মধ্যে মানুষ পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতি তার অজস্র প্রজাতির যে কোনো নিদর্শনই অফুরন্ত নষ্ট করতে প্রস্তুত। আর, খরগোস, হেরিং কিংবা মশার মতো এই গ্রহের আর পাঁচটা প্রাণীর সংখ্যা প্রকৃতি তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় যে ভাবে নিয়মিত করে, এতদিন পর্যন্ত মানুষের সংখ্যাও সেইভাবেই প্রকৃতি নিয়মিত করেছে এবং অক্ষম ক্লীবের ন্যায় মানুষকে তাই স্বীকার করে নিতে হয়েছে। মানুষ যদি বাধা না দেয়, প্রকৃতি যদি নিজেই এই কর্তব্য সাধন করে তাহলে এ ছাড়া আর কোনো স্বিতীয় প্রক্রিয়া

নেই। আর, এই প্রক্রিয়ার ফল অমানুষিক অপচয় এবং নির্মমতা।

মানুষের প্রজননও যদি খরগোস জাতীয় প্রাণীর মতোই চলতে থাকে, অথচ তৎসত্ত্বেও যদি মনুষ্যজাতির মোট সংখ্যা নিয়মিত রাখতে হয়, তার জন্য প্রকৃতিদেবীর অস্ত্রাগারে তিনটি প্রাণান্তক আয়ুধ রাখতে হয়েছিল : দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি এবং যুদ্ধ। আর, মানুষ নিজেই তার আত্মবিকৃতির দ্বারা প্রকৃতির হস্তে এই তৃতীয় আয়ুধটি তুলে দিয়েছে, যার নাম যুদ্ধ।

প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়াগুলির অন্যতম হচ্ছে, এক শ্রেণীর প্রাণীকে অপর শ্রেণীর শিকারে নিযুক্ত করা। প্যালিওলিথিক যুগে দেখা গেল, বাঘ বা সিংহের শিকারে পরিণত হওয়া থেকে মানুষ আত্মরক্ষার উপায় শিখে নিয়ে প্রকৃতিকে ফাঁকি দিয়েছে। অথচ তারপর মানুষ নিজেই আবার আত্মবিকৃতির রাস্তায় প্রকৃতির হাতের মুঠোয় গিয়ে পড়ল। কারণ প্রকৃতিকে সে এমন এক অস্ত্র তৈরী করে দিল, যে অস্ত্র প্রকৃতি কখনো তৈরী করেনি এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্য ছাড়া সে অস্ত্র তৈরী করা প্রকৃতির পক্ষে সম্ভবও ছিল না। মানুষে মানুষে যুদ্ধ বাধানোর এবং ক্রমশঃ সেই যুদ্ধকে নৃশংসতর করার উপায় উদ্ভাবন করে মানুষ নিজেই নিজের উপরে শিকারীর থাবা বিস্তার করল। শিকারী পশু হিসাবে বাঘ কিংবা সিংহের চেয়েও মানুষ আরও দক্ষ। এমনকি জীবাণুর চেয়েও সে আরও দক্ষ। অর্থাৎ আপনার শৌর্যবলে মানুষ প্রকৃতিদেবীর হাত থেকে তাঁর স্বহস্তে নির্মিত যে দুইটি বড় আয়ুধ পর পর খসিয়ে দিয়েছিল, তারই পরিবর্তে সান্ত্বনার পারিতোষিক হিসাবে প্রকৃতি দেবীকে সে নিজেই এই মনুষ্যসৃষ্ট অস্ত্রটি দিয়েছে, যার নাম যুদ্ধ। সিংহ বা বাঘের শিকার হিসাবে প্রকৃতি যেভাবে আমাদের প্রাণনাশের ব্যবস্থা রেখেছিলেন, প্যালিওলিথিক যুগেই সে ব্যবস্থা আমরা রদ করেছিলাম। জীবাণুর আক্রমণের দ্বারা আমাদের বধ করার যে আয়োজন ছিল, এ যুগে প্রকৃতিকে সে আয়োজন থেকেও আমরা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছি। প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে সংগ্রামে এই স্বিতীয় বিজয় অধিকতর উল্লেখযোগ্য, কারণ এই জয়লাভ ছিল দুঃসাধ্যতর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অযাচিত বদান্যতার দ্বারা প্রকৃতির কাজ আমরা নিজেরাই করে যাচ্ছি। তাও এমনভাবে করছি যে, বোধহয় প্রকৃতির একার শক্তিতে এও সার্থকভাবে তা করা সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধের প্রথাকে এখানেও বাঁচিয়ে রেখেছি।

ধরুন, যদি আমার ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হয়, ব্যাধিজনিত অকাল মৃত্যু রোধ করার সামর্থ্য অর্জনের পর, এখন যুদ্ধজনিত মৃত্যু রোধ করতেও আমরা সক্ষম হলাম। যদি প্রকৃতির উপরে মানুষের এই স্বিতীয় বিজয় সূচিত হয় তাহলে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যার স্বাভাবিক সাম্য অন্তত মনুষ্যজাতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টে যাবে। একজনের জীববৎকালেই এই পৃথিবীতে যদিও পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং তার মধ্যে স্বিতীয়টির পরিসমাপ্তি যদিও মাত্র ১৫ বৎসর পূর্বে ঘটেছে তথাপি ব্যাধিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস করতে পারার ফলে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা ক্রমশঃ বিস্ফোরক অবস্থায় এসে তো পৌঁচেছেই, তা ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিও চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়ছে। প্রকৃতির রাজত্বে মানুষের অভীষ্টকে জয়যুক্ত করার জন্য যে লড়াই চলেছে, এ পর্যন্ত তার মধ্যে দুইটি বৃহত্তম সাফল্য আমরা লাভ করেছি। প্রতিষেধক ঔষধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অধুনাতন আবিষ্কারগুলি তার একটি। এই সব আবিষ্কার যাতে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে ফলপ্রসূ হতে পারে তার জন্য যে আধুনিক প্রশাসনিক সংগঠন স্থাপিত হচ্ছে, সে হল আর একটি সাফল্য। এই দুইটি ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছি বলেই এখন প্রকৃতির সঙ্গে রণে ভঙ্গ দেওয়া আরও অসম্ভব—কারণ এই আংশিক বিজয়কে সার্থক সমাপ্তির মধ্যে স্থায়িত্ব দিতে হবে। এই গ্রহে মানুষের সংখ্যা নিরূপণের

জন্য যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছিল তার পরিবর্তে একটি মানবিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে আমরা সক্ষম হয়েছি বলেই আজ আমাদের সম্মুখে আর একটি প্রশ্ন অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সেই প্রশ্নের মীমাংসা থেকে আজ আর পালানোর উপায় নেই। যদি আমরা প্রজনন সংখ্যা নিয়মিত করতে সম্মত হই তাহলে এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের জয়-যাত্রাও সম্পূর্ণ হয়। অর্থাৎ একদিকে যেমন মৃত্যুর সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কমে গেছে, তেমনি অন্যদিকে প্রজনন সংখ্যাও যতখানি প্রয়োজন সেই অনুযায়ী স্বেচ্ছাকৃতভাবে কমিয়ে এবং নিয়ন্ত্রিত করে জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যাকে আমরা পুনরায় সামঞ্জস্যের মধ্যে আনতে পারি। বিকল্প হিসেবে মৃত্যুর সংখ্যা নিরূপণের দায়িত্ব আমরা প্রকৃতির হস্তেও ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের বর্তমান আংশিক সাফল্য অচিরেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে মনুষ্য জাতির আয়ুষ্কালও সীমাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়া হচ্ছে প্রজনন সংখ্যাকে সর্বোচ্চ গতিতে বর্ধমান রাখা। কারণ, তার হাতে মৃত্যুর সংখ্যাও সর্বোচ্চ গতিতেই বর্ধমান আছে। মানুষের চেষ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আজ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস করা গেছে, কাজেই যতদিন জন্ম মৃত্যুর আনুপাতিক হার সামঞ্জস্যের মধ্যে না আসছে ততদিন পৃথিবীর জনসংখ্যা স্ফীততর হতে থাকবে। তবে একটা কথা সুনিশ্চিত, যেকোনো উপায়েই হোক একদিন না একদিন এই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হবেই। এই পৃথিবীতে কোনো প্রাণীই তার সংখ্যা যথেচ্ছভাবে বাড়াতে পারেনি, বা পারা সম্ভব নয়। জীবসত্ত্বা গঠিত হওয়ার জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন, পৃথিবীতে তার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। যখন বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীরা তাদের সংখ্যা স্বেচ্ছাকৃত চেষ্টার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে না; অথবা করতে ব্যর্থ হবে, তখন তাদের প্রজনন সংখ্যা বহিঃশক্তির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে। মানবেতর প্রাণীরা নিজেদের জন্মের হার নিজেরা স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তাদের সংখ্যা হয় প্রকৃতি, নয় মানুষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং হতে থাকবেও। মানুষের সংখ্যাও নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য, কিন্তু এর জন্য প্রকৃতির উপরে মানুষকে নির্ভর করতে হয় না, স্বহস্তে আত্ম-সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ করার এই অসামান্য ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে।

মানুষের ভবিষ্যৎ শুভ অশুভ যাই হোক্, নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তের উপরে। ধরুন, আমরা স্থির করলাম, ব্যাধিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা যে ভাবে হ্রাস করা হয়েছে, ভবিষ্যতেও সেইভাবে আরও হ্রাস করা হবে। ধরুন, আমরা স্থির করলাম, যুদ্ধজনিত মৃত্যুও আমরা অসম্ভব করে দেব। ধরুন, তারপর আমরা জন্মসংখ্যা হ্রাস করার দুরূহতর কর্তব্যও সম্পন্ন করলাম। এ প্রচেষ্টা দুরূহতর এই জন্য যে, শুধু বিভিন্ন সরকারের মধ্যে চুক্তি সাধনের দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন করা যাবে না। কোটি কোটি স্বামী-স্ত্রী যদি নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে কোটি কোটি সিদ্ধান্ত করতে পারেন, তবেই এই কার্য সিদ্ধ হতে পারে। কিন্তু মানুষকে তার সন্তান-সন্ততি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা যায় না। যথেষ্ট সময় দিলে একমাত্র শিক্ষা এবং আলোচনার দ্বারাই তাদেরকে এই কাজে সম্মত করানো যায়। কিন্তু ধরুন এর জন্য যতদিন সময় লাগবে, পৃথিবীর মোট খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ বিজ্ঞানের সাহায্যে সর্বোচ্চ সীমায় তুলে এনে আমরা ততদিন পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করলাম। ধরুন, এর মধ্যে পৃথিবীর মানুষের সংখ্যা আমরা সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত করতেও সক্ষম হলাম। যদি সত্যই তা সম্ভব হয় তাহলে আদর্শ মনুষ্যজীবন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারাকে কাজে রূপায়িত করারও নূতন সম্ভাবনা দেখা দেবে।

এই পৃথিবীতে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, সংজীবন যাপনের প্রশস্ততম সুযোগ সে

যাতে যথাসম্ভব পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হব। আর, এক্ষেত্রে বলা বাহুল্য, সৎ বলতে আমি মানসিক মূল্যবোধের দিক থেকে যা ভাল তা-ই বোঝাতে চাইছি। মানব হিতের প্রয়োজনে পৃথিবীর জনসংখ্যা নিয়মিত করার তাৎপর্য আছে, কারণ এই নিয়ন্ত্রণের ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে পৃথিবীর প্রতিটি মনুষ্য সন্তানের মূল্যবোধ স্বীকৃত হবে। এতে করে ভবিষ্যতে মানব সন্তান একটি মূল্যবান প্রজাতির মূল্যহীন নিদর্শনরূপে প্রকৃতির হাতে আর নিগৃহীত হবে না।

এবার আমাদের সম্মুখে আর যে বিকল্প আছে তার আলোচনায় আসা যাক। এখনও অনেক দেশে প্রকৃতিই মানুষের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু প্রকৃতিকে সেই অধিকারই যদি আমরা দিই তাহলে বিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ সার্থকতা কাজে লাগিয়েও আমরা যতটুকু খাদ্যোপাদন বৃদ্ধি করতে পারব, তা দিয়ে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না। এতে হয়তো সর্বনাশের দিন পিছিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাও বেশীদিনের জন্য নয়। প্রকৃতি দেবীর কাছ থেকে প্রত্যাঘাত আসবেই। আর সেই আঘাতে তাঁরই জয় হবে। কারণ, তাঁর হাতে এখনও একটি প্রাণান্তক আয়ুধ রয়েছে, যে আয়ুধ মানুষ কেড়ে নিতে পারে নি। দুর্ভিক্ষই সেই আয়ুধ। জন্মের হার যদি আমরা প্রকৃতিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে দিই তাহলে এমন একদিন আসবে, যখন প্রকৃতি এই দুর্ভিক্ষের অস্ত্র অবশ্যই নিক্ষেপ করবে। আর, দুর্ভিক্ষ তার সহযাত্রীরূপে যুদ্ধ ও মহামারীকে ডেকে আনবে। এমনকি, প্রাক পারমাণবিক যুগেও যদি এই ঘটনা ঘটত তাহলেও মানবিক আদর্শ এবং লক্ষ্যগুলির দিক থেকে দেখলে মানুষের পক্ষে এ দুঃসহ পরাজয় বলেই গণ্য হত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মানবিক প্রক্রিয়া আধাআধি প্রয়োগ করার পরে আবার প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাহলে আমাদের খরগোস কিম্বা হেরিং-এর স্তরে অধঃপতিত হতে হয়। মানবেতর জীবেরা হাজারে হাজারে জন্মাচ্ছেও, মরছেও। নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের এর চেয়ে কম নির্মম এবং কম অপচয়মূলক কোন পদ্ধতির ক্ষমতা তারা রাখে না। কিন্তু বর্তমান পারমাণবিক যুগে মানুষের জন্য এই অধঃপাতগ্রস্ত ভবিষ্যতের পথও খোলা নেই। কারণ দুর্ভিক্ষ যে যুদ্ধকে সাথে করে নিয়ে আসবে, সে অতীতের তীর ধনুকের লড়াইও নয়, গোলা বন্দুকের যুদ্ধও নয়। এ সেই প্রলয়ঙ্কর পারমাণবিক যুদ্ধ। কাজেই এই দুই ভবিষ্যতের একটিকে আমাদের বেছে নিতে হবে। মানবিক এবং মনুষ্যোচিত পদ্ধতি অনুসারে জন্ম সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা, অথবা দুর্ভিক্ষের পরিণতিরূপে যে পারমাণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হবে, তাতে মনুষ্যজাতির সমূহ আত্মবিলুপ্তি ঘটানো।

দুর্ভিক্ষের অভিশাপ সম্বন্ধে সমসাময়িক যুগের কোনও ইংরেজরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। ইংরেজের ইতিহাসে দেখা যাবে যে গত ছয় শত বৎসরের মধ্যে তার দেশে কোন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। এমন কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ইংল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি। আমি নিজে গোটা যুদ্ধের সময়টাই ইংল্যাণ্ডে কাজ করেছি এবং যুদ্ধকালীন র‍্যাশন দিয়েই আমাকে চালাতে হয়েছে, কিন্তু একদিনের জন্যেও আমাকে ক্ষুধার তাড়না অনুভব করতে হয় নি। কিছুকাল পূর্বে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কিছু লোক যারা মুক্তিলাভ করেছে, তাদের পক্ষে এ চিন্তা মাথায় আনাও সহজ নয়। কিন্তু যেমন ভারতবর্ষ, সেখানে দুর্ভিক্ষ এখনও প্রত্যক্ষ বাস্তব। মানবজাতির দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশীর ভাগ লোকের উপরে এখনও দুর্ভিক্ষের ছায়া শকুনের মতো উড়ছে। শেষ এই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বাঙালা দেশের উপরে যখন পড়েছিল সেও তো মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বেকার কথা।

তবে, আমার ধারণা, জন্ম সংখ্যা নিরোধের ব্যাপারে ভারত সরকার যতটা উদ্যোগী এবং জনসাধারণ যতখানি সক্রিয়, ততখানি সরকারি উদাম বা জনসাধারণের সক্রিয়তা আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

সুতরাং শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, খাদ্য ও জনসংখ্যার সমস্যা যদি মেটাতে হয় এবং যুদ্ধকে যদি আমরা বিলুপ্ত করে দিতে চাই তাহলে মনুষ্যজাতিকে একটি অখণ্ড বিশ্বজনীন সমাজের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হয়। একটি দেশ কিম্বা কোন একটি মহাদেশের জন্মের হার নিয়ন্ত্রণের দ্বারা গোটা মনুষ্যজাতির জন্ম সংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। পশ্চিমে অনেক দেশে জন্মের হার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পৃথিবীর জনসংখ্যা বিপজ্জনক গতিতে এখনও ক্রমবর্ধমান। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে যদি প্রকৃতই কার্যকরী করতে হয় তাহলে একে বিশ্বব্যাপী প্রচেষ্টায় রূপ দিতে হবে। অন্য দিকে, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টাকে যদি যথার্থ সার্থকতা দিতে হয় তাহলে দুনিয়ার চাষযোগ্য সমস্ত ভূমিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অখণ্ড এবং এককরূপে পরিচালনা করতে হবে। আর, পৃথিবীর যেখানেই যে খাদ্য উৎপন্ন হোক না কেন, পৃথিবীর যে প্রান্তে মানুষ ক্ষুধার্ত সেখানে সেই খাদ্য পৌঁছে দিতে হবে। জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হতে যতদিন লাগবে ততদিন আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে আত্মরক্ষা করব ভাবছি, কিন্তু এই সাংগঠনিক প্রয়োজনগুলি যদি চরিতার্থ না হয় তাহলে বিজ্ঞানও পঙ্গু হয়ে পড়বে। এই প্রয়োজনগুলি মূলতঃ রাজনৈতিক। খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহের কর্তৃত্ব স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট-গুলির পরিবর্তে যদি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বিশ্বকর্তৃত্বমূলক সংস্থার হস্তে স্থানান্তরিত করা না হয় তাহলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে না। এই প্রয়োজনের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে যদি একত্র করা যায় তাহলেই দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বরাষ্ট্র গঠনের দ্বারা মনুষ্যজাতির ঐক্যসাধনের প্রয়োজনীয়তাও উপস্থিত হয়েছে।

অতএব পুরোপুরি যদি নাও হয়, নূন্যপক্ষে অন্তত কতকগুলি রাজনৈতিক সংস্থার ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের বর্তমান যুগে মনুষ্যজাতির আত্মরক্ষার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই লক্ষ্যটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পরম মূল্যবান। সমগ্রভাবে মনুষ্যজাতি যদি আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে মানুষের অস্তিত্বও থাকছে না, মানুষকে যোগ্য জীবনের উত্তরাধিকার দেওয়ার সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হচ্ছে। আমাদের সম্মুখে যে নূতন শঙ্কা দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির আত্মঘাতী হওয়ার এই শঙ্কা থেকেই আমাদের মনে বিশ্বব্যাপী দেশাত্মবোধের প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়া উচিত। আর, ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জাতীয় সত্তার প্রতি আমাদের যে সনাতন আকর্ষণ রয়েছে, তার ঊর্ধ্বে এই বিশ্বজনীন দেশাত্মবোধ আজ আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, গোটা অস্তিত্বটাই যদি ধ্বংস হয়, এর কোনো অংশবিশেষ সেই নিধনযজ্ঞ থেকে রক্ষা পাবে না। সুতরাং মনুষ্যজাতির ঐক্যসাধন অপরিহার্য লক্ষ্য। কিন্তু এই ঐক্যসাধনের লক্ষ্যকে আমি এ পর্যন্ত যেভাবে বর্ণনা করেছি, তাতে মনে হবে, প্রয়োজনের স্বার্থবোধ থেকেই মানুষের উচিত এই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত হওয়া। অথচ মানুষের একটা মস্ত বড় চরিত্র লক্ষণই এই যে, প্রয়োজনের স্বার্থ যত বড়ই হোক, তার পক্ষে সেই স্বার্থ-বোধের তাগিদ কখনোই যথেষ্ট নয়। দুঃখকে এবং মৃত্যুকে জয় করার জন্য যে প্রবল অনুপ্রেরণা দরকার, সে অনুপ্রেরণা শুধু বৈষয়িক তাগিদ থেকে মানুষ লাভ করতে পারে না।

শুধু তাই নয়, যদি নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধও করতে পারে তাহলেও তার আত্মার ক্ষুধা অতৃপ্ত থেকে যাবে।

ঐক্যবদ্ধ পরিবাররূপে মানুষ যে একত্র জীবনযাপন করবে, তার ভিত্তিমূলে তাহলে আর কি প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রেরণা থাকতে পারে? খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত একটি নাটকের একটি পংক্তিতে আমি এই প্রেরণার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। নাটকটি লিখেছিলেন এশিয়া থেকে আফ্রিকায় আগত ঔপনিবেশিকদের মধ্যে এক কবি, কিন্তু ইনি তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত করেছিলেন রোমে এবং তাঁর সাহিত্য রচনা সমস্তই লাতিন ভাষায়। তাঁর উক্তিটি এই : 'আমি মানুষ, মানুষের ধন আমার কাছে কিছুই যাবে না ফেলা।' এই লাতিন কবির মাতৃভাষা ছিল পিউনিক, অথবা ফিনিসীয়, অর্থাৎ হিব্রুর সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সাদৃশ্যযুক্ত। কাজেই হিব্রু ভাষায় লেখা এক অজ্ঞাতনামা ইজরাইলী কবির একটি উক্তি আমার মনে পড়ল। সেই বিখ্যাত উক্তিটি প্রতিবাদী প্রশ্নের আকারে জিজ্ঞাসিত হয়েছিল। ঈশ্বর যখন কেইনকে তার ভ্রাতা আবালের হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করেছিলেন, তখন কেইন আত্মপক্ষ সমর্থনে তার প্রতিবাদ আরম্ভ করেছিল এই উক্তির দ্বারা : 'আমি কি আমার ভ্রাতার প্রতিপালক?' *Book of Genesis*-এর কাহিনী অনুসারে প্রশ্নটি স্বর্গীমাংসিত। ঈশ্বর মনে করেন এই প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক নয়। সুতরাং কেইনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঈশ্বর সরাসরিই তাঁর রায়ে ঘাতককে দণ্ডাদেশ দিলেন।

এখানে ঐক্যসাধনের জন্য যে মহৎ প্রেরণার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, সে প্রেরণা সাময়িক প্রয়োজনের স্বার্থে সীমাবদ্ধ নয়। যতই জরুরী এবং যতই শোভন হোক, কোনো বৈষয়িক বিবেচনাবুদ্ধির দ্বারা এই প্রেরণা সীমিত নয়। এখানে সম্পূর্ণে ভিন্ন প্রকৃতির এক প্রেরণার সাক্ষাৎ আমরা পাচ্ছি। এই প্রেরণা বাসনা বিমুক্ত, অফলপ্রত্যাশী। বাসনার প্রয়োজনও তার নেই, কারণ তার অপরিহার্যতা অন্তর্নিহিত। মানুষের স্বভাবের মতোই এই প্রেরণাও সমান পুরাতন এবং যতদিন কোনো মানুষ জীবিত থাকবে ততদিন এই প্রেরণাও জীবিত থাকবে। আমরা একে অপরের প্রতিপালক। যদি একটি মাত্র মানুষের স্বার্থও কোনো ব্যাপারে জড়িত থাকে, সে ব্যাপারে মনুষ্য জাতির পক্ষে উদাসীন থাকা কোনো মতেই সম্ভব নয়। এই উপলব্ধিকে আমরা সত্য বলে জানি এবং এই সত্য পালনের আহ্বান শুধু কর্তব্যবোধ সঞ্জাত নয়, ভাবাবেশ সঞ্জাত প্রেরণা। একথা নিঃসন্দেহ যে, যেদিন প্রাক্-মনুষ্যস্তর থেকে আমরা মনুষ্যস্তরে উন্নীত হয়েছি, সেইদিন থেকেই এই সত্যোপলব্ধিকেও প্রত্যেকেই আমরা অল্প-বিস্তর মাত্রাধিক আঘাতে আহত করেছি। *Book of Genesis*-এর যে অনুচ্ছেদটি আমি উল্লেখ করলাম, তার অজ্ঞাতনামা লেখক বলছেন যে, মানুষ মানুষকে হত্যা করার ঘটনা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল মানুষের দ্বিতীয় প্রজন্মেই। প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শনেও দেখা যাবে যে, দুইটি নৃশংস মারণপর্বের অন্তবর্তীকালেও মানুষ পরস্পরের প্রতি অমানুষিক হৃদয়হীনতার আচরণ দেখিয়েছে। ইতিহাসের জঘন্যতম নৃশংসতার ঘটনাও আমাদের প্রজন্মেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। যতই ক্ষুদ্র হোক, আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি নরনারীই এই মহা-পাপের কিছু না কিছু অংশভাগী। হয়ত এর জন্য তাঁর নিজের দায়িত্বের অংশ বৃহৎ নয়, কিন্তু পরস্পরের প্রতি আমাদের এই পাপ প্রত্যেকের বিবেকের উপরেই ভার হয়ে রয়েছে। আমরা জানি, উপলব্ধিও করি যে, মানুষ হিসাবে যেহেতু আমরা পরস্পরের ভ্রাতৃতুল্য সেইজন্যই পরস্পরের সঙ্গে একত্রে এক পরিবারের মতো বাস করা আমাদের কর্তব্য। আসলে মানব সৌভ্রাত্রের মূল প্রেরণা এইখানেই।

মানুষ যে-সভ্যতার আওতায়ই গড়ে উঠুক না কেন, এই সৌভ্রাত্রবোধ তার জন্মগত। ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে যাঁরা গড়ে উঠেছেন তাঁদের হৃদয়ের প্রসারতা অনেক বেশী। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ জেনে এসেছে যে, শুধু মানুষে-মানুষে নয়, সমস্ত প্রাণীজগতের প্রত্যেকের সঙ্গে আমরা সৌভ্রাত্র বন্ধনে আবদ্ধ। আমার বিশ্বাস যে, পশ্চিমের কোনো আগন্তুক ভারতবর্ষে এলে প্রথমেই একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়বে—পশ্চিমের দেশগুলিতে বন্য পক্ষী, এমনকি পশুরাও মানুষকে যতটা ভয় পায়, ভারতবর্ষে তাদের মধ্যে ততটা ভয় দেখা যায় না। তাদের ভাব দেখে মনে হয় যেন মানুষ তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে বলে তারা ভাবে না। অভিজ্ঞতা থেকেই বন্য প্রাণীদের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ভাব জন্মেছে। বন্য পশু পক্ষীরা এদেশের মানুষের কাছে যে অপেক্ষাকৃত বেশী মমত্ববোধের পরিচয় পেয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, এঁরা বিশ্বসৌভ্রাত্রকে শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। সাম্প্রতিককালে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে, এই পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণবস্তুরই উৎস এক। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে সমস্ত প্রাণীকে যেভাবে আত্মীয়জ্ঞানে স্বীকার করা হয়েছে, তার মধ্যেই এই সত্যের চেতনা হাজার হাজার বৎসর পূর্বে দেখা দিয়েছিল। এও আর একটি আশ্চর্য ঘটনা, যেখানে intuition-এর দ্বারা মানুষ বিজ্ঞানের সত্যকে বহু পূর্বেই অনুমান করেছিল।

আমি নিশ্চিত যে, এই প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তি এবং ভ্রাতৃভাবের ধ্রুপদী অভিব্যক্তি ভারতবর্ষের সমস্ত যুগের সাহিত্যেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাবে। ভারতীয় সাহিত্যে অজ্ঞতার দরুণ আমার পক্ষে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই অজ্ঞতার জন্যই আমার বক্তব্যের সমর্থনে সংস্কৃত, পালি অথবা তামিল সাহিত্যের পরিবর্তে লাতিন ও হিব্রু সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে হল। এই অন্তর্নিহিত সৌভ্রাত্র প্রত্যেকেই আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি, কিন্তু কার্যত অনেকেই অনুসরণ করতে পারি না। এর সমর্থনে ভারতীয় সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিতে আমি অসমর্থ বটে, কিন্তু এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমি একজন ভারতীয়ের উল্লেখ করতে পারি। অশোক শুধু সম্রাটরূপে বিখ্যাত নন। সম্রাট ভাল মন্দ বহু ছিলেন। সুতরাং শুধু সম্রাট বলেই কেউ মানুষের মধ্যে স্মরণযোগ্য স্থান লাভ করে না। অশোক বিখ্যাত এই জন্য যে, তিনি এই সার্বজনীন সৌভ্রাত্রবোধকে কার্যে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁকে যে অসাধারণ নৈতিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তাও যথার্থ। কারণ, মানুষকে সমান ভ্রাতৃভাবে মানুষরূপে গণ্য করার এই অসামান্য সুযোগ যেমন রাজশক্তি দিতে পারে, তেমনি রাজশক্তির দ্বারা যে-মানুষ বলীয়ান তাঁর পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও বিবেকের নির্দেশ লঙ্ঘনের লোভ সম্বরণ করা এবং বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী চালিত হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

অশোককে মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে এইজন্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের পরিবর্তে তিনি বিবেকবুদ্ধিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর এই কীর্তি আরও উল্লেখযোগ্য, কারণ রাষ্ট্রনীতি হিসাবে যুদ্ধকে পরিত্যাগ করার জন্য একালের মানুষ যে প্রত্যক্ষ, জরুরী প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করছে, প্রাক-পারমাণবিক যুগের মানুষ অশোকের জন্য সেই তাগিদ ছিল না। তৎকালে সবচেয়ে মারাত্মক যে অস্ত্র মানুষের আয়ত্ত ছিল, যদি তাই নিয়েই অশোক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন তাহলেও সমগ্র মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর প্রজাবৃন্দ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমন বিপদের কোনো সম্ভাবনাও ছিল না। তিনি যদি কলিঙ্গ বিজয়ের পর, ভারতীয় উপদ্বীপের শেষ প্রান্ত অথবা সিংহল

পর্যন্ত তাঁর বিজয় অভিযান চালিয়ে যেতেন তাহলেও তো তাঁর এই ধরনের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। প্রত্যেক রাষ্ট্র শাসককেই একটা দুরন্ত বাসনায় পেয়ে বসে—তাঁরা তথাকথিত প্রাকৃতিক সীমারেখার দ্বারা সাম্রাজ্যকে সুগঠিত করার জন্য কেবলি আত্মপ্রসারের দিকে অগ্রসর হন। এমন কার্যে অশোকও নিজেকে যুক্তিসঙ্গতভাবেই এই সান্ত্বনা দিতে পারতেন যে, শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ফলে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে শান্তি তিনি সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে স্থাপন করতে পারতেন।

এই সনাতন যুক্তিচিন্তায় অগ্রসর না হয়ে অশোক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কর্মপ্রণালী গ্রহণ করেছিলেন। আক্রমণাত্মক যুদ্ধে তিনি যে কলিঙ্গ রাজ্যকে মৌর্য সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রাস করেছিলেন, এই অপরাধের জন্য তাঁর মনে এক নৈতিক বীতস্পৃহা দেখা দিয়েছিল। সারাজীবন এরই দ্বারা তিনি চালিত হয়েছেন। তাঁর আক্রমণাত্মক অভিযান যে নৃশংসতা এবং দুর্গতি ঘটিয়েছিল, সেই দৃশ্য দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। সৌভ্রাত্রবোধের বিরুদ্ধে তিনি যে অপরাধ ঘটিয়েছেন তার জন্য নিজের বিবেকের সম্মুখে তিনি অপরাধী হয়ে দাঁড়ালেন। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিজ রাজবংশের এবং অন্য সমস্ত রাজবংশেরই, যা চিরাচরিত রীতি তার থেকে সরে দাঁড়ালেন। চিরাচরিত রীতি থেকে অশোকের এই ব্যতিরেক আরও লক্ষণীয় এইজন্য যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধের অন্যায় পন্থা গ্রহণ করাটা শুধু মৌর্যদেরই একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল না। যে সব রাজন্যশক্তি এই পন্থা গ্রহণের ক্ষমতা রাখেন, তাঁদের মধ্যেও এর ব্যবহার পৃথিবীর সর্বত্র সার্বজনীনভাবে প্রচলিত। আলেকজাণ্ডারের অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকে প্ররোচিত করেছিল। সাইরাসের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন আলেকজাণ্ডার স্বয়ং। এইভাবে যেন কর্মের বিপরীত চক্র অনুসরণ করে এই ধারা চলে গেছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মিশরীয় এবং সুমেরীয় সাম্রাজ্য নির্মাতাদের আমল পর্যন্ত। এই পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে সরে এসে অশোক সৌভ্রাত্রবোধের আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করার জন্য জীবনের অবশিষ্টাংশ এবং তাঁর রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করেছিলেন।

অশোক যুদ্ধ বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতির ঐক্যসাধনের সংকল্পকে বিসর্জন দেন নি। সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে অতঃপর তিনি ভিক্ষুবাহিনীর দ্বারা তাঁর এই লক্ষ্য-সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি সিংহলেও আপন প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, শুধু সেখানেই নয়, তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তের আরও পশ্চিমে যেখানে তৎকালে আলেকজাণ্ডারের অপকৃষ্ট ম্যাসিডনিয়ান গ্রীক উত্তরাধিকারীর রণতাণ্ডব চলছিল, সেখানেও তাঁর প্রভাব পৌঁছেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের আচার ও বিশ্বাস সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণের দ্বারা অশোক নিজের প্রভাব তাঁর সাম্রাজ্যসীমার বাইরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় প্রচার কার্যের জন্য তাঁর কাজে কোনো প্রাকৃতিক সীমানার বাঁধন ছিল না, ভূপৃষ্ঠের যেখানেই মানুষের বাস আছে সেখানেই বৌদ্ধধর্মের বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন। সমগ্র পূর্ব এশিয়া জুড়ে আজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা ছড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আধ্যাত্মিক সৌভ্রাত্রবোধ পৃথিবীর ঐক্যসাধনের পক্ষে প্রধান সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছে এবং এখনও করছে। তাদের এই সৌভ্রাত্রবোধ বর্তমান কালে বোধ হয় আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে। ভারতভূমিতে প্রধান দুইটি বৌদ্ধ তীর্থস্থান, সারনাথ ও বুদ্ধগয়া পরিদর্শন করে তিন বৎসর পূর্বে আমার অন্তত এই ধারণাই হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রাণময়তা এবং সর্বত্রগামিতার আরও অনেক

কারণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবার আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের হৃদয় পরিবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্মের এই বিস্তার এবং প্রাণময়তা সম্ভব হয়েছিল—তাঁর হৃদয়ের পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনজনিত অভিজ্ঞতাকে কার্যে রূপায়নের ফলেই এ সম্ভব হয়েছিল।

অশোকের কার্যাবলী থেকে এ বিষয়ে আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষে মানবিক সৌভ্রাত্রবোধ শুধু মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি যতদূর জানি, অশোক মৃগয়া নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাঁর সভাসদবর্গের জন্য নিরামিষ আহারের প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং তাঁর রাজ্যে বৎসরে ছাপ্পান্ন দিন পশু হত্যা আইনত নিষিদ্ধ ছিল। এই তিনটি অনুশাসনের মধ্যেই জীবপ্রেমের ভারতীয় আদর্শ প্রতিফলিত হচ্ছে। ভারতবর্ষের প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির এই ঐতিহ্য আরও একটি অসাধারণ ঘটনায় প্রমাণিত হয়—হুবহু এই তিনটি অনুশাসনই অশোকের ১৮০০ বৎসর পরে আর একজন ভারতসম্রাট বলবৎ করলেন, তিনি সম্রাট আকবর।

আকবর যে-ধর্মপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে এই অনুশাসনগুলি প্রয়োগ করেছিলেন, সে বৌদ্ধধর্ম নয়, জৈনধর্ম (কারণ কমপক্ষে এর চার শত বৎসর পূর্বেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল)। তবু সে প্রেরণাও ভারতীয়ই। বিদেশীরা যদি ভারতের অধ্যাত্মশক্তির প্রভাবে আসেন তাহলে সেই শক্তি তাঁদের কি পরিমাণে বশীভূত করতে পারে, তার একটি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত স্বয়ং আকবর—কারণ ভারতবর্ষে জীবন অতিবাহিত করার ফলে এই তুর্কী-সন্তানের চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাকে আমরা 'ভারতীয়করণ' বলে আখ্যা দিতে পারি। তৈমুরের সাময়িক অভিযানের কথা বাদ দিলে আকবরের পূর্ব-পুরুষেরা ভারতবর্ষে কেউ পদার্পণ করেন নি—তাঁর পিতামহ বাবর প্রথম ভারত আক্রমণ করেন। বাবর তাঁর জীবনের যতটা সময় খাইবার গিরিবর্ত্মের পশ্চিমাঞ্চলে যাপন করেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। বাবরের পৌত্র আকবরকেও মুসলমানরূপেই মানুষ করা হয়েছিল। তাছাড়া, ইহুদি গোষ্ঠীর অন্য দুইটি ধর্মের ন্যায় ইসলামধর্মও একান্তভাবেই আপন চিন্তার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং ভারতবর্ষে যেসব ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের জন্ম হয়েছে, তাদের তুলনায় ইসলামের মনের কপাট অনেকটা রুদ্ধ। তৎসত্ত্বেও আকবরের মধ্যে ভারতীয় প্রভাব এমন গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল যে, তিনি নিজের ধর্ম নিজেই রচনা করে নিয়েছিলেন। আকবর প্রবর্তিত দীন ইলাহির মধ্যে প্রশস্ত হৃদয়বৃত্তির যে উদারতা দেখতে পাওয়া যায়, সে একান্তভাবেই ভারতবর্ষীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

জন্তু জানোয়ারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অশোকের মতো আকবরও বর্জন করেছিলেন, কিন্তু অশোকের মতো মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। অবশ্য বাস্তবের দিক থেকে, আকবরের পক্ষে এই সংকল্প গ্রহণ করা অশোকের চেয়ে দুরূহতর হত সন্দেহ নেই। অশোক যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, তার ক্ষমতা পূর্ব থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আকবরের পিতামহের সৃষ্ট সাম্রাজ্য তাঁর পিতা হারিয়েছিলেন, সেই হৃতরাজ্য আকবর পুনরুদ্ধার করেন। আকবর যদি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধকেও বর্জন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁকে সিংহাসনই হারাতে হত, এমন কি হয়ত নিজের জীবনও। তথাপি এই অনুমান হয়ত মিথ্যা নয় যে, দৈবক্রমে আকবরের স্থানে যদি অশোক জন্ম নিতেন তাহলেও অশোক ঠিক তাই করতেন, যা তিনি নিজের জীবনে করে গিয়েছেন।

আজিকার পারমাণবিক যুগে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সেই মনোভাবের জন্ম হওয়া দরকার যে মনোভাব অশোকের ছিল। আজ ঐক্য ছাড়া আর মানবজাতির কোনো বাঁচবার পথ নেই। কিন্তু গায়ের জোরেও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার উপায় নেই। আজকের দিনে মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে বল নয়, অন্তরের পরিবর্তনই একমাত্র পথ। পারমাণবিক যুগে বল-প্রয়োগের দ্বারা ঐক্য সম্ভব নয়, আত্মনিধন সম্ভব। অশোক তাঁর কালে কেবল বিবেকের প্রেরণায়ই যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, আজকের দিনে ভয় এবং বিবেক, দুই-ই সেই নীতির দিকে আমাদের নির্দেশ করছে।

বিশ্বজনীন ঐক্য সংস্থাপনের আশু প্রয়োজন সম্বন্ধে এবং সেই প্রয়োজন যদি আমরা সময় মতো পূরণ করতে না পারি তাহলে আত্মনিধন যজ্ঞের দ্বারা যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে সে সম্বন্ধেও উপরোক্ত অংশে আমি আলোচনা করলাম। অতঃপর মনুষ্যজাতির ভবিষ্যত সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতে চাই। বলা বাহুল্য যে, এই সম্ভাবনাগুলি মোটেই স্পষ্ট নয়। আমি এই আলোচনার নামকরণ করছি : 'বিশ্বজনীন ঐক্য স্থাপনের পথে অগ্রগতি'। কিন্তু এই নামকরণের মধ্যেই কি পুরো একটা বিতর্কের অবকাশ থেকে যাচ্ছে না? আজকের দিনের ঘটনাবলী দেখে একথা কি মনে হয় না যে, ঐক্যের দিকে অগ্রসর না হয়ে পৃথিবী বরং তার থেকে দূরে, ক্রমশ দ্রুততর গতিতে দূরে সরে যাচ্ছে?

রাজনীতির ক্ষেত্রে আজকের দিনে সবচেয়ে লক্ষণীয় গতি কোন্ দিকে? সে কি সাম্রাজ্যগুলি ভেঙে পড়া এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকে গতি নয়? ১৯৪৭ সালের পর ভারতীয় উপমহাদেশে যে ঘটনাবলী অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যেও এই বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রাভিগ গতির নাটকীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। অতীতের মৌর্য, গুপ্ত এবং মুঘল শাসনের ন্যায় বৃটিশ শাসনও ভারতবর্ষের গোটা উপমহাদেশটাকে এক অখণ্ড শাসনপাশে আবদ্ধ করেছিল। এমন কি পূর্বেকার তিনটি শাসনকালে যত না ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, গত শতাব্দীতে বৃটিশ শাসনকালেই তার চেয়ে আরও সুসংহতরূপে এই ঐক্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শক্তি যখন প্রত্যাহৃত হল তখন বৃটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের স্থলে একটি নয়, দুইটি রাষ্ট্র দেখা দিল। ১৯১৮ সালে হ্যাপসবার্গ রাজবংশের পতনের পর পূর্বে ইউরোপে যেমন কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিকভাবে নানা রাষ্ট্রের মধ্যে সীমারেখা তৈরী হয়েছিল, ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের সীমারেখাও তেমনি কৃত্রিম-ভাবে টানা হয়েছে। কাশ্মীর অঞ্চল এখনও বিতর্কের বিষয়ীভূত, তার সম্বন্ধে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়নি। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই ঠিকই, কিন্তু এখন আবার এই সীমানার অভ্যন্তরবর্তী অঞ্চলে আর একটা কেন্দ্রাভিগ গতি দেখা দিয়েছে। আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীন প্রশাসনিক মানচিত্র নূতনভাবে রচনা করা হচ্ছে।*

অনুবাদ : **অমিতাভ চৌধুরী**

[আগামীবারে সমাপ্য]

* আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

আধুনিক সাহিত্য

গীতিকবিতা বললে 'লিরিক'-এর প্রতিশব্দ বুঝিয়ে থাকে। অতি প্রাচীন কালে শুরু হয়ে সাহিত্যের এই ধারা আজও অব্যাহত আছে। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে কবিতার শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে অলংকারশাস্ত্রসম্মত যেসব ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রচলিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধের মধ্যে কাব্যের আকার-প্রকারের কথা বলতে গিয়ে সেই শ্রেণীগত বিভিন্নতার সরল সারকথাটুকু এইভাবে বলেছিলেন যে কাব্যের 'রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে'—অর্থাৎ বাইরে থেকে কেবল চেহারা দেখেই কোনো রচনাকে বিশেষ কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধি মনে করা ঠিক নয়। একটি বিস্ময়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছিলেন। তাঁর সেই উদাহরণটি একালেও অচল হয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন, 'এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে।'

না, চেহারামাত্র দেখে কোনো রচনাকে নাটক বলাও সংগত নয়, 'গীতিকবিতা' বলে মেনে নেওয়াও সুবিবেচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া সংক্ষিপ্ত শ্রেণীব্যাখ্যাটি এই : 'তিনটি শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা প্রথম দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; দ্বিতীয়, আখ্যানকাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনাবিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী প্রভৃতি গদ্যকাব্য ইহার অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। তৃতীয়, খণ্ডকাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ডকাব্য বলিলাম।' এবং—'খণ্ডকাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে।' অতঃপর গীতিকাব্যের বস্তুপ্রকৃতি এবং ভাবপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় উদ্যত হয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গীতের স্বরচাতুর্য এবং কবিতার শব্দচাতুর্য, —আদর্শ গীতিকবিতার অবলম্বন প্রধানতঃ এই দুই উপাদান। কিন্তু 'দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল। কাজে-কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতি-কাব্যের পার্থক্য জন্মে।' এই ইতিহাসটুকু বলে নিয়ে তিনি পরিশেষে গীতিকবিতার এই সূত্র দিয়েছিলেন : 'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতা মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয়স্পন্দন ব্যতিরেকে গীতিকবিতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত! হৃদয়ে কোনো-রকম সুখ-দুঃখের ঢেউ দেখা দিলে মানুষ তার কতকটা ব্যক্ত করে, কিছুটা অব্যক্ত থেকে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির

রুদ্ধ হৃদয় মধ্যে উচ্ছ্বাসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; বক্তব্য এবং অবক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান ভেদ বলিয়া বোধ হয়।'

অতএব গীতিকবিতার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাতে ভাবুকের হৃদয় ধরা পড়ে। কথাতে সুরেতে এমন এক সম্মিলন ঘটে যায়, যার ফলে কথার অতিশায়ী ব্যঞ্জনা দেখা দেয়। ভাবের প্রগাঢ় ঐক্য এবং সুখ-দুঃখের অপরিসীম নিবিড়তাই গীতিকবিতার প্রকাশ্য লক্ষ্য। সব ভালো জিনিসের মতন ভালো গীতিকবিতাও সত্যিই বিরল!

ফরাসী "গীতাঞ্জলি"র ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী আঁদ্রে জিদ্ লিখেছিলেন : 'মহাভারতের ২১৪,৭৭৮ শ্লোক, এবং রামায়ণের ৪৮০০০ শ্লোকের পর গীতাঞ্জলি,—আঃ, কি আরাম! হায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌলতে ভারতবর্ষকে অবশেষে স্বল্পতাদোষে দোষী হইতে হইল,—সে জন্য আমি তাঁহার নিকট কত না কৃতজ্ঞ! এই যে দৈর্ঘ্যের বদলে মহার্ঘতা, ভাবের বদলে সার,—এ পরিবর্তনে আমাদের কত না লাভ! কারণ গীতাঞ্জলির ১০৩টি ক্ষুদ্র কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিই যথেষ্ট সারগর্ভ।' শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অনুবাদ। থেকে এই উক্তিটুকু প্রায়ই মনে আসে। বাংলা বইয়ের আয়তন একালে বাড়তির মুখে। কেবল উপন্যাস বা প্রবন্ধের বইয়েতেই যে এই আধুনিক প্রবণতা দেখা দিয়েছে, তা নয়। স্মৃতিকথা, আত্মকথা, আত্মজীবনী বা আপন কালের কথা বলতে গিয়ে আজকাল লেখকদের কথা যেন ফুরোতেই চায় না! কিন্তু গদ্য-রচনার ক্ষেত্রে সে-রকম অতিব্যাপ্তি যতোই ঘটুক, এবং বাংলা কবিতার ধারা সাম্প্রতিককালে যতোই পরিস্ফীত দেখাক না কেন, কোনো আধুনিক বাঙালী কবিকেই এখন আর ভূরি পরিমাণে লিখতে দেখা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতার প্রায় আটশ' পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি সংকলন হাতে পেয়ে মনটা প্রথমেই কিঞ্চিৎ দুলে ওঠা অসংগত নয়। ১৮৬০ থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উৎপন্ন মোট পাঁচশ' বাংলা গীতিকবিতা একসঙ্গে বেঁধে দিতে হলে গুচ্ছটির কায়িক স্থূলতা নিবারণ করবার উপায় থাকে না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত উনিশ শতকের বাংলা কবিতার এই অতিস্ফীত তাই প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। এই পাঁচ শ' কবিতার লেখক সর্বসমেত পঁচাত্তরজন। ছটি খণ্ডে কবিতাগুলি সাজানো হয়েছে। এই ষট্-বিভাগের শিরোনাম যথাক্রমে : প্রেম-কবিতা, দেশপ্রেমের কবিতা, গার্হস্থ্য জীবনের কবিতা, প্রকৃতি-কবিতা, বিষাদ-কবিতা এবং তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। সম্পাদকদের বিচারে প্রেম, দেশপ্রেম এবং গার্হস্থ্য জীবনের কবিতাগুলিই সর্বাধিক সার্থক বলে মনে হয়েছে। তাঁরা এ-পর্বে বাংলার কবিসমাজকে প্রকৃতিবর্ণনা বা বিষাদ-ভাবনা বা তত্ত্বচিন্তার কাব্যাবেগ প্রকাশে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ এবং কম ইচ্ছুক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 'প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা' আলোচ্য সময়ে যে খুবই কম লেখা হয়েছে, সে-কথাও তাঁরা জানাতে দ্বিধা করেননি এবং আলোচ্য ক্ষেত্র থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ উহ্য রেখেই এ-সব মতামত জানানো হয়েছে। জন্মকালের পারম্পর্য ধরলে ঈশ্বর গুপ্ত (জন্ম ১৮২২) থেকে শুরু করে পঙ্কজিনী বসু (জন্ম ১৮৮৩) পর্যন্ত খ্যাত-অখ্যাত নানা কবির সুদীর্ঘ একটি তালিকা এখানে ভিন্নভাবে, অর্থাৎ পূর্বোক্ত পর্যায়ে সাজানো হয়েছে বলে বোঝা যায়। তবে কবিদের আয়ুষ্কালের সন-তারিখে হয়তো কিছু গরমিল আছে। বহুৎ ব্যাপারে সে-রকম ঘটাও স্বাভাবিক। সেটা এ-রকম সংকলনের প্রধান আলোচনার বিষয় নয়। অতীতের পঞ্চাশ

বছরের বাংলা কবিতার সংকলন থেকে প্রধানতঃ দুটি প্রসঙ্গ জানতে ইচ্ছে হয়—প্রথমতঃ এতে সত্যিকার কাব্যগুণ ছিল কী পরিমাণে,—দ্বিতীয়তঃ এঁদের দৃষ্টি বা আগ্রহ বা মনন-কল্পনার ব্যাপ্তি কী রকম!

সম্পাদকদ্বয় বলেছেন যে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেই বাংলা গীতিকাব্যের আধুনিক স্তরের সূত্রপাত হয়। বলাবাহুল্য, এ-কথাটা বড়োই চিত্তচমৎকারী! তাঁরা এই যুক্তি দিয়েছেন যে, বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী", "নিসর্গসন্দর্শন", "বন্ধুবিয়োগ" এবং "প্রেমপ্রবাহিনী",—হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর প্রথম খণ্ড, ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাসের "প্রসূন" কাব্য, বলদেব পালিতের "কাব্যমালা" ও "ললিত কবিতাবলী" এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "কাব্যকলাপ" ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা হয়েছিল,—অতএব এঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, আধুনিক কালের গীতিকবিতা বাংলায় সেই বছরেই 'প্রতিষ্ঠিত' হয়েছে! সেইসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, '১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের "সংগীতশতক" কাব্যটি রোমান্টিক গীতিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য।' আর, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখসূত্রে এঁরা চমকপ্রদ ভঙ্গিতে বলেছেন—'বর্তমান সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং শতাব্দীর সাধনার পূর্ণ ফল তাঁহাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।' এ-কথা অবিশ্যি 'তুলনাত্মক আলোচনা'র পরিশ্রম ব্যতিরেকেই যে-কেউ বলতে পারতেন! তবে ভূমিকার আর-একটি মন্তব্য দেখে এঁদের তুলনা-প্রয়াসের প্রকৃতি বা অনুসৃত আদর্শ সম্বন্ধে মনে খট্‌কা দেখা দেয়। সে মন্তব্যটি বলে নেওয়া দরকার। কথাটি এই : 'এই সংকলনে পদ্য ও গান আমরা গ্রহণ করি নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র এবং আঁদ্রে জিদের কথা সেই সূত্রেই একসঙ্গে মনে এলো। ১৮৬০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর চেয়ে প্রবীণতর এবং তরুণতর, মুষ্টিমেয় কয়েকজন কবিই সত্যিকার গীতিকবিতা লিখেছিলেন। বাকি সবই পদ্য! সেই ভাবরসনিবিড় সত্যিকার গীতিকবিতার লেখকসংখ্যা পঁচাত্তরের চেয়ে সত্যিই অনেক কম।

কিন্তু পঁচাত্তরেও আপত্তি নেই। পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতার ধারাটি পাঠকের ধারণায় সঞ্চার করতে হলে সরবরাহের কাজটি একটু বেশি পরিমাণেই করা হয়তো ভালো। অনেক কবিই সম্পদহীন, অসহায়, বিস্মরণযোগ্য। সম্পাদকের দাক্ষিণ্য ব্যতিরেকে কাব্যানুরাগীর স্মৃতি অধিকার করে ভবিষ্যতে টিঁকে থাকবার সামর্থ্যবর্জিত তাঁরা। অতএব, তাঁদের সংরক্ষণ কতকটা প্রত্নানুশীলনের এলাকাভুক্ত। বাংলা বইয়ের বাজারে সত্যিকার কাব্যরসের চাহিদা বাড়লে, তবেই হয়তো সার্থকতর, নিবিড়তর, কৃশতর—অর্থাৎ অন্যতর সংকলন প্রকাশের আয়োজন সম্ভব হতে পারবে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ কবিতার সঙ্গে গবেষণা এবং কাব্যসুখের সঙ্গে বহুতর তথ্যপীড়া একই পাত্রে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকবেই। অধ্যাপক-যুগলকে আবহাওয়ার এই দুরবস্থা মেনে নিয়েই কাজ করতে হয়েছে। তা না হলে শ্রীকুমারবাবুর মতন অধিকারী ব্যক্তি কোনো কারণেই কি কুঞ্জলাল রায় বা গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বা নগেন্দ্রবালা মুস্তোফীর প্রগল্‌ভতাকে 'পদ্য' না বলে 'গীতিকবিতা' বলতেন? না-কি রমণীমোহন ঘোষের 'দেবশিশু'-কে গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা বলতে তিনি বা তাঁর তরুণ সহযোগী অরুণকুমার রাজী হতেন? ঐ 'দেবশিশু'র বিষয়বস্তু মোটেই গার্হস্থ্য নয়। একটি শিশু একলা পথের ধারে বসে খেলা করছিল,—চোরে চুপিচুপি তার গা থেকে সোনার গয়না খুলে নেয়,—শিশু কিন্তু তাতে কাঁদে নি,—'কেবল উঠিল হাসি'! এবং ফলে,

নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ
গৌর শিশুর পানে
চাহি'—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া
চোরের কঠোর প্রাণে!

চোরের এই চিত্তদাহ রোম্যাণ্টিক বটে,—কিন্তু এ-রচনা আর যাই হোক গার্হস্থ্যজীবনের রোম্যাণ্টিক গীতিকবিতা নয়। একে বরং সুনীতিব্রতী পদ্য বলা যেতে পারে!

কিন্তু সম্পাদকরা এ-ক্ষেত্রেও অসহায়। কারণ, তাঁদের সংকলন থেকে এ-ধরনের লেখা বাদ দিতে হলে বাংলাদেশের বহুশ্রুত কবিত্বের খ্যাতি সত্ত্বেও সে পর্বের বাংলা কবিতার তিন-চতুর্থাংশই হয়তো বর্জিত হওয়া দরকার! সে দিকে নজর রেখে, তাই, এ-ক্ষেত্রে এইকথাই বক্তব্য যে পদ্যের প্রতি উপেক্ষার ভাবটুকু পরের সংস্করণে ভূমিকা থেকে তাঁরা প্রত্যাহার করতে পারেন কি না ভেবে দেখবেন। বিষয়বিভাগের যে পরিকল্পনা তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সেটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিষয়বস্তুর বিভাগে আপত্তি নেই, কিন্তু তা কাব্যগুণের অধীনস্থ থাকা দরকার। অর্থাৎ, আগে কাব্যগুণ আছে কিনা তাই বিচার্য,—তার পরে বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে।

আরো একটি কথা ভেবে দেখা উচিত। অসংখ্য মন্দকবির মধ্যে সত্যিকার ভালো কবিও ভিড়ে হারিয়ে যান। খুব বড়ো কবিদের কথা আলাদা। কিন্তু এখানে 'ভালো কবি' মানে মাঝারি কবি। এবং মাঝারি যাঁরা, ভিড়ের মধ্যে তাঁদের হারাতে দেওয়া কখনোই সমীচীন নয়। প্রস্তুত সংকলনে সম্পাদকরা সেদিকে দৃষ্টি রাখলে পাঠক সুখী হতেন।

কিন্তু আমাদের দেশ, কাল, রুচি এবং সামর্থ্যের পরিসীমা সম্বন্ধে অবহিত থেকে, ১৮৬০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত, মোট পঞ্চাশ বছরের বাংলা গীতিকবিতা এবং বাংলা পদ্যধারার ভেতর দিয়ে বাঙালী জীবনের অন্তরালোড়নের প্রকৃতিটি বেশ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেওয়া কি অসম্ভব? এই সময়সীমার শেষ প্রান্ত সম্বন্ধে আপত্তি নেই। বঙ্গভঙ্গের ঢেউ নেমে যাবার তারিখ মোটামুটি ঐ ১৯১০। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সর্বস্বীকৃত আদর্শ। কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী তখন আর কেউই ছিলেন না। বাংলা কবিতার ধারায় সে-কালটিকে বিশেষ এক পর্বান্ত এবং পর্বসূচনার সন্ধি বলে মেনে নিতে প্রবল কোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু ১৮৬০-এর ঐ আদি-সীমা থেকে কয়েক বছর পেছিয়ে যেতেই বা আপত্তি কি? ভূমিকায় সম্পাদকরা বলেছেন : 'নবজাগ্রত কাব্যরসপিপাসু বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী উপাখ্যান" কাব্যে।' মধুসূদনের 'অন্তর্মুখী গীতিকবিতার রোম্যাণ্টিক বিষাদের সুরটি' যেহেতু আরো কয়েক বছর পরের ঘটনা,—তাঁর 'আত্মবিলাপ' যেহেতু ১৮৬১তে প্রকাশিত হয়, সেজন্যে ১৮৬০ থেকেই আলোচ্য পর্বটি সূচিত হয়েছে। বেশ, তাও স্বীকার্য। কিন্তু কবিতার রাজ্যে নতুন ভাবাদর্শের প্রবর্তন-প্রয়াস আরো কয়েকবছর আগেকার ঘটনা। রঙ্গলাল তাঁর বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব শুনিয়েছিলেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫০ থেকে ১৯০০ হলেই এখানকার পর্ববিস্তারটি হয়তো সমীচীন হোতো। তবে, ১৮৫০ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত এগিয়ে যেতেও বাধা নেই। এবং এই বিস্তারের মধ্যে বাংলা কবিতায় দেশের মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং পারমার্থিক ভাব, চিন্তা, আশা, আকাঙ্ক্ষা কী-ভাবে আবর্তিত হয়েছে সেটা ভালোভাবে দেখতে সাহায্য করবার সুযোগ ছিল এ-রকম সংকলন-প্রয়াসের মধ্যেই। এই দিকটি বিশদ করবার জন্যেই একটি দৃষ্টান্ত মনে আসছে। কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাপারের কথা হলেও, সে-কথা

এই সূত্রে পরিবেষণ করলে ভাবের দিক থেকে দূরান্বয় দোষ ঘটবে না।

আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রকৃতি নিরীক্ষার কাজে নেমে একজন অধ্যাপক এই ধরনের বিশ্লেষণের পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস অবিশ্যি এক জিনিস,—ইংরেজি কবিতার সংকলন অন্য ব্যাপার! ইতিহাসে যা বলা যায়, কাব্যসংকলনের মধ্য দিয়ে ঠিক সে-কাজ কি করা যায়? এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই স্বীকার্য। কিন্তু সে-রকম সংকলনের আদর্শও ইংরেজিতে আছে কিছু কিছু। যাই হোক, কোনো একটি পর্বের কবিতা সংকলনের কাজে উদ্যত হলে ইতিহাস প্রদর্শনের ঝোঁকটুকু মেনে নিতে পারলে ভালো হয়। সেইজন্যেই এ-প্রসঙ্গের অবতারণা। ইংরেজিতে আলোচ্য ধরনের বই অনেকই আছে। এখানে তারই একখানির কথা তোলা গেল।

বিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যেই ইংলণ্ডের রাজনীতিতে সংরক্ষণপন্থী দলের পরাজয় এবং উদারনৈতিক দলের প্রাধান্য ঘটেছিল। সে-দেশের উদারপন্থী দল উনিশ-শ' ছয় খ্রীষ্টাব্দে ক্ষমতা হাতে পাবার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই জনসাধারণের যাতে উপকার হয়, এ-রকম কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে. ডব্লিউ. কানলিফ তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বইয়ের মধ্যে সংক্ষেপে এইসব ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। ১৯০৬ সালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workers' Compensation Act), ১৯০৭ সালে ক্ষুদ্র-ভূ-সম্পত্তি আইন (Small Holdings Act), ১৯০৮ সালে বার্ধক্য-ভাতা-ব্যবস্থা (Old Age Pensions), ১৯১১ সালে জাতীয় বীমা আইন (National Insurance Act), -এবং ১৯১২ সালে নূনতম বেতন আইন (Minimum Wage Act) চালু হয়। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের কয়েক বছর আগে লয়েড জর্জ জাতীয় বীমা আইন বিধিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু সেকালের সেই দীনবন্ধু লয়েড জর্জই যুদ্ধের ধাক্কায় পড়ে অতঃপর যুদ্ধ-বিজয়ের নেশায় মেতে উঠেছিলেন বলে শোনা যায়। যুদ্ধের দুর্যোগের মধ্যে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া সারা য়ুরোপ প্রচুর পরিমাণে অ্যামিরিকার কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হয়েছিল। উনিশ-শ' উনিশ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-চুক্তির সাহায্যে ছিন্ন-ভিন্ন য়ুরোপের আর্থিক দুর্গতি রোধ করবার ক্ষীণ চেষ্টা দেখা গেল বটে, কিন্তু দেশের বুকে দুর্ভাগ্য তার আগেই তার চরম আঘাত হেনে গেছে।

রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে তখনকার সেই ব্যাপক দুর্গতির আবহাওয়া গভীর কোনো শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল যে ছিল না, সে-কথা বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। সমাজে যখন ব্যাপকভাবে অবসাদ আর অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে, সাহিত্যের সৃষ্টিপ্রেরণাও তখন দেশ থেকে অন্তর্হিত হয়।

বিশ শতকের সূচনাপর্বে ইংলণ্ডে অর্থনীতি, বিজ্ঞানসাধনা এবং ধর্মবিশ্বাস, এই তিন ক্ষেত্রেই নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী ইংলণ্ডের যুব-চিত্তের প্রকৃতি বিশ্লেষণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে চার্লস ই. জি. মাস্টারম্যান লিখেছিলেন যে নানা তথ্য ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তই তাঁর কাছে গ্রাহ্য মনে হয়েছিল যে ইংলণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসে বা খ্রীষ্টানোচিত মনোধর্মে তখন ভাটা লেগেছে,—খ্রীষ্টান ইংলণ্ড তখন 'পেগ্যান' হয়ে পড়েছে! এ মন্তব্য যাঁদের কাছে প্রকৃত অবস্থার অতিরঞ্জন বলে মনে হবে, অধ্যাপক কানলিফ তাঁদের জন্যে ধর্মযাজকপুত্র ই. এফ. বেন্‌সনের একটি লেখা থেকে তখনকার অবস্থা সম্বন্ধে 'ধর্মবিমুখতার ঢেউ' (A wave of irreligion) কথাটি স্মরণ করেছেন। ১৯১৪

থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত সারা ইংলণ্ডে এই ঢেউয়ের প্রবলতা অনুভব করা গেছে। যুদ্ধের আগে থেকেই এর সূত্রপাত হয়,—এবং যুদ্ধের চার বছরের মধ্যে তার তীব্র প্রকোপ দেখা যায়। আর, ১৯৩২ সালে বার্মিংহামের বিশপ তাঁর লেখার মধ্যে এইকথাই বলে গেছেন বলে অধ্যাপক কানলিফ উল্লেখ করেছেন। ধর্মবিশ্বাসের এই দুরবস্থার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক। সমুচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে অধ্যাপক সে-কথাও বুঝিয়েছেন। যে প্রবল অধ্যাত্মবিশ্বাসের জোরে শেক্‌স্‌পীয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলতে পেরেছিলেন —'There's a special providence in the fall of a sparrow',—

কিংবা— There's a divinity that shapes our ends,
Roughhew them how we will,

সেই ধর্মবিশ্বাস, পরলোক-ধারণা এবং ঈশ্বর-স্বীকৃতি যদি শেক্‌স্‌পীয়রের সমকালীন পাঠকচিত্তে একেবারেই না থাকতো, তাহলে তাঁর কথা শুনতো কে? ওয়ার্ডস্‌বার্থের লেখা থেকেও অধ্যাপক কানলিফ এইরকম অধ্যাত্ম-প্রত্যয়ের উদাহরণ তুলে দিয়েছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের দুশো বছর পরে এসে কবি ওয়ার্ডস্‌বার্থও বলতে পেরেছিলেন যে মানব-জীবনের বিচিত্র ঘটনাধারার যাবতীয় বিষাদসত্যের অস্তিত্ব উপেক্ষা না-করেও একথা মানতে বাধা নেই যে, অসীম শক্তি ও অশেষ করুণাময় কোনো এক সত্তার সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যেই আমাদের অদৃষ্টের যাবতীয় উত্থান-পতন আশ্রিত! আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টিতে যেসব ব্যাপার আপাতিক বা পূর্বাপর-সংযোগহীন বলে মনে হয়, সে-সব ঘটনাও আমাদের অগোচর কোনো এক পরমকারুণিক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত!* তারপর উনিশ শতকের মধ্যপর্বে কবি টেনিসনের 'In Memoriam'-এর মধ্যে দেখা গিয়েছিল যে কতকটা ক্ষীণ-ভাবে হলেও তিনিও সেই একই প্রত্যয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন—

stretch faint hands of faith, and grope,
And gather dust and chaff, and call
To what I feel is Lord of all,
And faintly trust the larger hope.

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ পর্বে পৌঁছে এই আশাবাদ, আস্তিক্য এবং ভবিষ্যতে বিশ্বাসের জোর আরো কমে গিয়েছিল। অধ্যাপক কানলিফ বলেছেন যে গত শতকে বিজ্ঞানের প্রতি অতিশ্রদ্ধার ফলে যে অধিযান্ত্রিক নিয়তিবাদ (Mechanistic determinism) দেখা দিয়েছিল,—বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে অন্ধ বিশ্বাসের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল, বিশ শতকে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার নতুনতর গবেষণার ফলে সে-গোঁড়ামির গোড়া আলগা হয়ে যায়। অক্সফোর্ডের অধ্যাপক স্যর জেম্‌স জীন্‌স্ এবং স্যর আর্থার এডিংটনের আবিষ্কার এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। কেম্ব্রিজের গণিতবিদ্ বার্ট্রাণ্ড রাসেল এই নব্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে এই কারণেই লিখেছিলেন যে আমাদের এতোকালের অভ্যস্ত নিউটনীয় ঘনবস্তুতত্ত্বের ধারণা হরণ করে এ-বিজ্ঞান ক্রমশঃ এক অবাস্তব স্বপ্নমায়ার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে

* That the procession of our fate, howe'er
Sad or disturbed, is ordered by a Being
Of infinite benevolence and power;
Whose everlasting purposes embrace
All accidents, converting them to good.

স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌সে জানালেন যে বৈজ্ঞানিকরা আজ জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা পেয়েছেন, সে হয়তো তাঁদের আপন মনেরই ধারণা মাত্র,—মনের বাইরে হয়তো আর কিছুই নেই,—বিজ্ঞান বহু প্রযত্নে যে জ্ঞানের চর্চা করছে, সে হয়তো শুধুই স্বপ্ন, আর আমরা সেই স্বপ্নদ্রষ্টার মস্তিষ্কের কোষ ছাড়া অন্য আর কিছুই হয়তো না হতেও তো পারি!*

এও অধ্যাপক কানলিফের দেওয়া উদ্ধৃতি। জীন্‌সের কথার পরেই তিনি অক্সফোর্ডের আর-এক বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জন স্কট হ্যালডেনের প্রসঙ্গ তুলে বলেছেন যে, হ্যালডেন বিজ্ঞানের চেয়ে ধর্মের গুরুত্ব বেশি বলে স্বীকার করেছেন, কারণ বিজ্ঞান তো আমাদের শ্রেয়ের কথা ভাবে না,—ধর্ম যে আমাদের শ্রেয়ের দিকে চালিত করে!

ধর্ম এবং নীতিজ্ঞান হয়তো পরস্পরের প্রতিশব্দ! তবে, ধর্ম তো শুধু সঞ্চয়যোগ্য জ্ঞান নয়,—ধর্ম কর্মের মধ্যেই সার্থকতা খোঁজে। বিশ শতকের শুরু থেকে ইংলণ্ডে ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষীণতা এবং নৈতিক শৈথিল্য তাই পাশাপাশি অথবা যুগপৎ দেখা দিয়েছিল। লণ্ডনের বস্তিজীবন সম্বন্ধে জন মার্টিন নামে এক ভদ্রলোকের উল্লেখযোগ্য আলোচনা ছাপা হয় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে। সে বইখানির নাম *"A Corner of England!"* তাতে জন মার্টিন জানিয়েছিলেন যে, সে-সময়ে বস্তি অঞ্চলের ইংরেজ অধিবাসী চুরি বা মোটর-ডাকাতিতে নাম করতে পারলে পাড়ায় তার মর্যাদা বাড়তো! হয়তো বস্তি-জীবনের নৈতিক আদর্শ সব দেশেই সমান। ইংলণ্ডের ক্ষেত্রেই বা সে লোকব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটবে কেন? কিন্তু মার্টিনের এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে কানলিফ আরো একটু মন্তব্য জুড়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে বস্তির বহির্বর্তী সম্মানিত ভদ্রসমাজের মধ্যেও পুরোনো নীতিবোধের বিচ্যুতি একালের অনস্বীকার্য ঘটনা।

এইভাবে গত শতকের সঙ্গে বর্তমান শতকের তুলনার ফলে পাঠকের মনে এরকম বিশ্বাস দেখা দেওয়া অসম্ভব নয় যে, উনিশ শতকের ইংরেজের তুলনায় বিশ শতকের ইংরেজ বুঝি জাতিগতভাবে হীন হয়ে পড়েছে। অধ্যাপক বেশ জোরের সঙ্গে সেটাকে অমূলক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। সে দেশে জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শ্রম এবং সুখসম্পদের উত্তরোত্তর উন্নতিই চোখে পড়ে। অতএব অধ্যাপকের এ-সিদ্ধান্তও অভ্রান্ত যে বর্তমানে সৃজনী প্রতিভার পক্ষে সেদেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা যতোই প্রতিকূল মনে হোক, সেখানকার সাহিত্যিক মহলে বস্তুজগতের আনুকূল্য একালে বেড়েছে বই কমেনি। তাছাড়া উনিশ শতকের শেষ দশকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থস্বত্ব-আইন প্রবর্তিত হবার ফলে ইংরেজ লেখক-পাঠকের কাছে মার্কিন সাহিত্যের প্রচার বেড়ে গেছে; নাটক আর উপন্যাসের মহলে উৎসাহ-বৃদ্ধির কারণ ঘটেছে; ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে হেন্‌রি জেম্‌স্‌ তো তদানীন্তন নবীন ইংরেজ কথাসাহিত্যিকদের যৌনপ্রসঙ্গবীক্ষার সৎ সাহসের প্রশংসাই করে গেছেন; মনোবিজ্ঞানের আগ্রহ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার ফলে নিঃসংকোচ বিশ্লেষণেরও আর বাধা রইলো না! নারীজগতেও স্বাধীনতাবোধের আর দায়িত্ববৃদ্ধির সুযোগ এলো। অধ্যাপক কানলিফ দেখিয়েছেন যে, এই শতকে নানাবিধ প্রচারের কাজে উপন্যাস এবং নাটকের প্রচলন তো বেড়েইছে, তাছাড়া রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞানের দিকে এরকম ব্যাপক আগ্রহ ইতিপূর্বে আর কখনোই দেখা যায়নি।

* "The universe which we study with such care may be a dream, and we brain-cells in the mind of the dreamer."—Eos, or the Wider Aspects of Cosmogony (1929).

আর বেশি কথা নিষ্প্রয়োজন। একজন বিদেশী অধ্যাপকের লেখা বিদেশের সমাজ এবং সাহিত্যের এই বিশ্লেষণ এখানে এই উদ্দেশ্যেই স্মরণ করা গেল যে, উনিশ শতকের শেষার্ধ আর বর্তমান শতকের প্রথম দশকান্ত মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ-ষাট বছরের বিস্তারে, সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থসম্পর্কের ঢেউ খেতে খেতে এ-পর্বের বাঙালী কবিদের মন বে কী পরিমাণে বদলেছে, এ-সময়ের কবিতাবলীর আদর্শ একখানি সংকলনের ভেতর দিয়ে সেটা ভালোভাবেই দেখিয়ে দেবার সুযোগ ছিল। কিন্তু আলোচ্য সংকলনের সম্পাদকরা আহরণে যতোটা উৎসাহী, নির্বাচনে সে-রকম নন। বাংলায় এ-রকম বিশ্লেষণভিত্তিক একখানি কবিতাসংকলন সম্পাদিত হওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?*

হরপ্রসাদ মিত্র

* উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ন বুক এজেন্সি। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

সমালোচনা

সমুদ্র মানুষ—অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। মূল্য পাঁচ টাকা।
মনামী—নারায়ণ সান্যাল। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য চার টাকা।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জনপ্রিয় লেখক নন, সাহিত্য জগতে খুব পরিচিতও নন। নূতন লেখকের আবির্ভাব ঘটলে তাই আগ্রহ হয়। সাহিত্যে নূতনের অভিনন্দন প্রয়োজন। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তাই স্বাগত জানাচ্ছি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন লেখা আগে পড়িনি। তিনি আগে কিছু লিখেছিলেন কিনা সে-সংবাদ আমার জানা নেই। সুতরাং পূর্ব অনুশীলনের ধারাটি ধরতে আমি অক্ষম।

"সমুদ্র মানুষ" উপন্যাসটি মানিক স্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা। লেখককে আগেই বিচারকের দেউড়ি পেরিয়ে আসতে হয়েছে। অনুমান করি বহু তরুণ লেখকের সঙ্গে লেখককে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হয়েছিল। সুতরাং বইটির যে অসামান্যতা আছে তাতে সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিককালে নগদ বিদায়ের সম্বন্ধে আশঙ্কা থাকলেও অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এমন একটি গুণ আছে যে লেখক সম্বন্ধে আশান্বিত হবার যথেষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি।

মোবারক এবং শেখরের জাহাজী জীবন নিয়ে কাহিনীসূত্র বয়ন করা হয়েছে। শেখর গৌণ চরিত্র। চট্টগ্রামের অধিবাসী মোবারক তার বাপেরই মত জাহাজে কাজ নিয়েছিল। জাহাজেই জীবনের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। বিচিত্র শহর আর বিচিত্র লোকের সঙ্গে মোবারকের ক্ষণিকের পরিচয় গড়ে ওঠে। কিন্তু কোথাও আশ্রয় নেবার উপায় নেই। জাহাজের গুটিকতক নাবিক, সালোন নিয়ে মোবারকের এই দীর্ঘস্থায়ী জীবন। গৃহসুখ থেকে বঞ্চিত এই সব নাবিকরা কিছু পরিমাণে হয়ে ওঠে অসহায়, কিছু পরিমাণে উদ্দাম। জীবিকা তাদের মনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। মনও হয় যাযাবর। নীড়ের সুখ যেমন তাদের হাতছানি দেয় তেমনি দূরের দিগন্তটাও মন ভোলায়। এরই টানাপোড়েনে মোবারকের, জাহাজের নাবিকদের জীবন গঠিত।

উপন্যাসটিতে দুটি অংশ। এক মোবারকের ফেলে আসা জীবন—যেখানে তার আম্মাজান, বিবি জয়নাব এবং শামীনগড়ের বিচিত্র মানুষের স্মৃতি; অন্যটি জাহাজের জীবন—যেখানে সালোন, ক্যাপ্টেন এবং প্রিয় বন্ধু শেখর। দ্বিতীয় অংশে আরও একটি কাহিনী আছে যেখানে মোবারকের সঙ্গে লিলি ব্রুর পরিচয় এবং লিলি ব্রু-কে বিবাহ করবার জন্যে মোবারকের উদ্যোগ। কিন্তু অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের মত মোবারক জানল লিলি তারই পিতার সন্তান।

উপন্যাসটিতে মোবারকের স্মৃতি রোমন্থন অনেকটা অংশ জুড়েছে। সেজন্যে কাহিনীর গতি শ্লথ, মন্থর। গল্পটির আকস্মিক উপসংহার চমকপ্রদ সন্দেহ নেই, কিন্তু পাঠক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ওরেস্টিসের মত যন্ত্রণা ভোগ করলেও মোবারকের দার্শনিক চিন্তা বেমানান। কয়লা, লোহালক্করের সঙ্গে দিনরাত কাটালেও মোবারকের জীবনে তার স্পর্শমাত্র নেই। চরিত্রটি রোমাণ্টিক, লেখকের নিজস্ব চিন্তাও চরিত্রটির উপরে আরোপিত হয়েছে বলে মনে হয়।

বাংলা উপন্যাসে বিষয়বৈচিত্র্য কম। সেদিক থেকে উপন্যাসটির বিশেষত্ব আছে। জাহাজের নাবিকজীবন নিয়ে কাহিনী লিখতে গেলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এই উপন্যাসটিতেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে কিন্তু সে-অভিজ্ঞতার প্রয়োগ সর্বত্র সুচিন্তিত নয়। আর লেখক যেন ইচ্ছে করেই নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে অন্য জগতে পদচারণা করতে চেয়েছেন। ফলে উপন্যাসটি অবান্তরের পর্যায়ে পড়েছে। পড়তে পড়তে কনরাডের উপন্যাসগুলির কথা মনে আসে। কিন্তু কনরাডের উপন্যাসের বিস্মৃতি, বৈচিত্র্য, সমুদ্রের গভীরতা এবং তিক্ততার স্বাদ উপন্যাসটিতে নেই। আমার বক্তব্য হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একটি বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন যা কেবল বিষয়বস্তুর অভিনবত্বের জন্যেই দীর্ঘকাল পাঠক স্মরণে রাখত। বাংলা উপন্যাসের দিগন্তও বিস্তৃত হতে পারত। কিন্তু সে-আশা আপাতত সফল হয়নি। কেবলমাত্র একবার যেখানে ক্যাপ্টেন নিউ প্লিমাউথ থেকে সিডনীতে জাহাজ ফেরার সময়ে সেই দুর্ঘটনার কথা বলেছিল। জাহাজী শ্রমিকের জীবনের ভয়াবহতার পরিচয় সেখানে একান্ত বাস্তব হয়ে উঠেছে। 'ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সব জাহাজীরা তখন দেখল দূরের একটা ঢিবি। একটা দ্বীপ। রক্তলাল বালির চূর্ণ মেশানো দ্বীপ, থরে থরে আকাশের দিকে উঠে গেছে। মাথায় তার ক্রস। দ্বীপটাকে কেন্দ্র করে উড়ছে একদল সমুদ্র পাখী। জাহাজটাকে দেখে ওরা বুঝি বিশ বছর আগের এক দুর্ঘটনার কথা স্মরণ করে কেঁদে বেড়াচ্ছে।' সমুদ্র মানুষের এই পরিচয়টিই আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় চমৎকারিত্ব আছে। সেজন্যেই লেখকের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। তাই পরবর্তী রচনার জন্যে সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

জীববিজ্ঞানের প্রফেসর অবনীমোহন বিবাহ করেছিলেন গ্রামের মেয়ে অনুরাধাকে। অনুরাধার বাবা প্রাচীনকালের। জপ তপ মন্ত্র তাঁর জীবনের অবলম্বন। অনুরাধাও এই পরিবেশেই মানুষ। অবনীমোহনের পথ বিজ্ঞানের। সেখানে প্রাচীন বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। অনুরাধা এবং অবনীমোহনের জীবন সুখের হল না। দুটি ভিন্ন মতের দুই কোটিতে অবনীমোহন এবং অনুরাধা যখন আন্দোলিত তখন আবির্ভাব ঘটল প্রথমে সুবিমলের পরে মনামীর। মনামী প্রিয়ার জাতের। প্রেম ভালবাসার সাময়িক মূল্যকে সে স্বীকার করে, কিন্তু তাদের স্থায়িত্বে সে বিশ্বাসী নয়। ফ্যাসনদুরস্ত, আধুনিকা মনামী অবনীমোহনের চিত্তে ঘোর লাগায়, সুবিমলকেও আকর্ষণ করে কিন্তু ধরা দেয়না কাউকেই। অবনীমোহন এবং অনুরাধার জীবনের দ্বন্দ্বটি ঘনীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত অনুরাধা মৃত্যু বরণ করে। মনামী অবনীমোহনের জীবনে কথঞ্চিত শান্তি ফিরিয়ে আনে। কিন্তু বিজ্ঞানের নির্মম হস্ত মনামীর জীবনে নিয়ে আসে ব্যর্থতা। পরিণামে সুবিমলের সান্নিধ্যে এল মনামী। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মনামীকে নিয়ে সুবিমল কী সান্ত্বনা খুঁজে পেল তার কোন সংবাদ আর পাই না।

বইটিতে রবীন্দ্রনাথের "দুইবোন"-এর প্রভাব পূর্ণমাত্রায়। সুবিমল এবং অনুরাধার সম্পর্কটি অবনীমোহনের মনে যে প্রতিক্রিয়া জাগায় তা "নষ্টনীড়"-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। রচনাশৈলীতে "ঘরে বাইরের" প্রভাব আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে'-এর আদর্শেই অনুরাধার জীবন গঠিত যদিচ অনুরাধা এবং তনুকা একজাতের নয়। যে-প্রেরণা থেকে লেখক বইটি রচনা করেছেন তা হল আত্মকথা রচনারীতির নূতন পরীক্ষা করবার উৎসাহ। লেখক কোনটি কার আত্মকথা শিরোনামায় তা উল্লেখ না করে আত্মকথনটিতে প্রত্যেকটি চরিত্রের

নিজস্ব স্টাইল ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। প্রত্যেকের সংলাপে যে বিশেষ বৈচিত্র্য আছে উপন্যাসটি পড়ে তা মনে হল না। অবনীমোহনের বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের যে চূড়ান্ত রূপ দেখি তাও চরিত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত বলে মনে হয় না। মনামীর জগৎটি লেখকের একান্তই অপরিচিত। সে জন্য তার আত্মকথাতে এসে বারে বারে হোঁচট খেতে হয়। তার আবির্ভাব লগ্নটিকে স্মরণীয় করে তুলবার জন্যে নারায়ণবাবু স্টেশনে যে নাটকীয় দৃশ্যটি অবতারণা করেছেন তা ভাবপ্রবণতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। "মনামী" উপন্যাসটিতে একটি চরিত্র সুচিত্রিত। সে অনুরাধা। নিরক্ষরা, গ্রাম্য আবহাওয়ায় বর্ধিত অনুরাধার সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনেতিহাসের প্রতিটি ক্ষণকে লেখক সহানুভূতি দিয়ে দেখেছেন, লেখকের নিজ হৃদয়ের উত্তাপ এবং উত্তেজনা সেই চরিত্রটিকে অসামান্যতা দিয়েছে।অনুরাধার নারীজীবনের ব্যথা এবং বেদনা অবনীমোহনের সান্নিধ্যে এসে যে-ভাবে স্বচ্ছমথিত হয়ে উঠেছে তার চিত্রলিপি মনোমুগ্ধকর। অনুরাধার আত্মকথায় প্রবাদ প্রবচনের উদ্ধৃতিতে, মন্ত্র তন্ত্র এবং দৈবে বিশ্বাসের কথা জানিয়ে লেখক চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছেন। এ-বাস্তবতা জীবনবোধেরই নামান্তর।

প্রমথনাথ বিশী

The Wayward Wife and Other Stories. *By* Alberto Moravia. Secker & Warburg. London. 15*s*.

আমাদের যুগের সাহিত্যে অনেক রকমের হাওয়া বদল অনেকদিন থেকে চলেছে—তার তাগিদ কখনো কখনো ফ্রয়েডের, কখনো মার্ক্সের, কখনো অস্তিত্ববাদের, কখনো রম্যরচনার কখনো চেতনা প্রবাহের, কখনো শুধু আঙ্গিকের। এত রকমের সূদের মধ্যে আসলের খেই অনেক সময় হারিয়ে যায়—যেমন গল্প বলতে হলে গল্প বলার ক্ষমতার দরকার হয় সে কথা কি আমাদের আর মনে আছে?

মোরাভিয়া পড়লে মনে পড়ে। অন্তত তাঁর বেশির ভাগ ছোট গল্পেই গল্প বলার ক্ষমতা জাজ্বল্যমান। বস্তুত মোরাভিয়ার ক্ষমতা হয়ত উপন্যাসের বিরাট ক্ষেত্রকে ততটা ভরে তুলতে পারে না, ছোট গল্পের স্বল্প পরিসরেই তার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখার আপাতদৃষ্ট সরলতা সর্বদাই মনোরম, যে কোনো ঘটনার বর্ণনাই উজ্জ্বল, মানুষের শরীর মনের সম্বন্ধে উপলব্ধিতে তীব্র; কিন্তু *Agostino* এবং *Disobedience*-এর পরের উপন্যাসগুলিতে সম্পূর্ণ সার্থকতার অভাব, বিশেষত বহুপ্রচলিত *Women of Rome*-এ। সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্তি মেলে তাঁর ছোট গল্পে।

কিছুকাল আগে "চতুরঙ্গ"-এ মোরাভিয়ার 'দুই গণিকা' নামে একটি গল্পের অনুবাদ করেছিলাম, সেই গল্প বর্তমান বই-এ আছে 'Home is a Sacred Place' নামে। তাছাড়া আরো দুটি অসাধারণ গল্প এ বইয়ে আছে, তার মধ্যে The Wayward Wife অতুলনীয়। তারপরেই নাম করতে হয় প্রথম গল্পটির—Crime at the Tennis Club. মাঝে মাঝে মোরাভিয়ার মধ্যেও একটা বাহাদুরী, অতি-নাটকে ভাব এসে পড়ে—A Bad Winter বা Contact with the Working Class- এ তার পরিচয় আছে। কিন্তু পূর্বোক্ত দুটি গল্প

অপূর্ব। কারণ তার মধ্যে গল্প বলার ক্ষমতার যে পরিচয় আছে তা হালের লেখকদের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। এ সব গল্পে মনে হয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মোরাভিয়া সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। ইতালীয় নিও-রিয়ালিস্ট সিনেমায় যে আপাতদৃষ্ট নিরাসক্তি আছে, মোরাভিয়া তাকে আরো অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যেন শুধু গল্পই আছে, গল্প লেখক নেই। অনেক ক্লাসিক লেখকের মতো মোরাভিয়ারও গল্পের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার কোনো তাড়াহুড়ো নেই, চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর অনুভব এত উজ্জ্বল, কৌতূহল এত গভীর যে গল্পের সুডৌল গড়ন কখনো হিসেবে দেখা দেয় না, অন্তরালে থাকে। কোনো কিছু প্রমাণ করার জন্য তিনি অস্থির নন। চিত্রশিল্পী যেমন আপেলের বা গাছের ছবি আঁকেন তেমনি তাঁর লেখা। যাদের বিষয়ে গল্প লেখা হচ্ছে তারা যে 'আছে' এইটে অনুভব করাই তাঁর উদ্দেশ্য। মনে হয় যেন আমাদের অনুভব করানোর কোনো তাগিদ নেই, নিজের অনুভব করাটাই সব কিছু। কোনো লোকের অস্তিত্বের অনুভূতি যখন সম্পূর্ণ সত্য হয়ে ওঠে, তখন গল্প পড়ে পাঠকের শুধু একটি অনুভূতি হয় তা নয়, যেন নিজস্ব অভিজ্ঞতা হয়। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং নিরাসক্তির ফলেই এটা সম্ভব হয়। কোনো কিছু প্রমাণ করার তাগিদ নেই বলেই চরিত্র সম্বন্ধে অনুভব গভীর হয়ে ওঠে।

Crime at the Tennis Club-এ কয়েকটি লোক ঠাট্টা করতে গিয়ে একটি মেয়েকে আচমকা খুন করে বসে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, অবশ্য ভালো নয়, দেখতে কুশ্রী; কিন্তু তার ধারণা সে যুবতী, উচ্চ সমাজের লোক, তাকে দেখে সবাই রোমাঞ্চিত। তার এই হাস্যকর আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে ঠাট্টা করতে গিয়ে হঠাৎ সেটা উদ্দেশ্যহীন খুনে পরিণত হয়। শেষ পর্যন্ত মোরাভিয়ার বক্তব্য এই লোকদের জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, এই মেয়েটির অর্থহীন আত্মপ্রবঞ্চনার করুণতা। কিন্তু সে বক্তব্য গভীরে প্রচ্ছন্ন, বাইরে থেকে গল্প শুধু গল্প—কী করে ঘটনাটা হল, কী রকম লোক, কী রকম মেয়ে এইটাই চোখে পড়ে; এবং শুধু চোখে পড়ে নয়, চোখের ওপর স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে।

আত্মপ্রবঞ্চনা মোরাভিয়ার বিশেষ কৌতূহলের বিষয়—সে আত্মপ্রবঞ্চনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চকের কোনো ধারণা নেই, যে লোক নিজে এক, ভাবে আরেক। অথচ তাদের সম্বন্ধে মোরাভিয়ার কোনো অবজ্ঞা বা অনুকম্পা নেই, বিরক্তি নেই। জীবন কত বিচিত্র একথাও তিনি সজোরে ঘোষণা করার কোনো চেষ্টা করেন না। শুধু লোকের ও ঘটনার সত্যাকে উপলব্ধি করার ফলেই গল্প শেষ করে পাঠকের মনে হয় তার নিজের-ই যেন একটি অভিজ্ঞতা হল। The Wayward Wife-এর নায়িকা উচ্চ সমাজের জীবনে প্রবেশ করার জন্য আকুলি বিকুলি করে, সম-অবস্থার লোকের প্রতি তার অপরিসীম অবজ্ঞা। সম্ভ্রান্ত বংশের একটি ছেলের সম্পর্কে এসে তার প্রেমভাবও ঐ কৌলিণ্যের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করে। যখন জানতে পারে যে সে ঐ ছেলেটির অবৈধ ভগিনী তখন পৃথিবীকে কী নির্মম মনে হয়—জাতে ওঠার উপায় হাতে এসেও ফস্কে গেল। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপককে বিয়ে করে মনে হয় কী অপদার্থ। অবশেষে বিবাহ-বহির্ভূত এক যৌন অভিজ্ঞতার পর স্বামীর প্রথম পরিচয় সে পায়, যেন বাস্তব পৃথিবীকে সে প্রথম চোখে দেখল। এই মেয়েটির আত্মচেতনার অভাব, আমাদের অভিভূত করে, কিন্তু মোরাভিয়ার চোখে যেন সে, তার সুবিধাবাদী প্রেমিক, তার কুটিল পরামর্শদাতা, তার সাধারণ স্বামী সকলেই সমান, কেননা সকলেই বেঁচে আছে। মানুষ যেন প্রকৃতির মতো—কোনো গাছ লম্বা, কোনোটি বেঁটে, কারোর ডালপালা বেশি কারো কম, কারো শিকড় গভীর কারোর ওপর ওপর। কোথাও ছায়া, কোথাও আলো, দিন যায়, রাত্রি

আসে, আবার দিন। কোনটা ভালো কোনটা মন্দ—এ প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা জানি যে মমতাবোধ ছাড়া আত্মবহির্ভূত কোনো চরিত্রকে উপলব্ধি করা যায় না, তার অস্তিত্বকে জীবন্ত করে তোলা যায় না।

অনেকের লেখা পড়ি যাতে তত্ত্বকথা প্রচুর, এটা ওটা প্রমাণ করার অস্থির তাগিদ—কিন্তু মানুষের পরিচয় ও উপলব্ধি সেখানে নেই। মোরাভিয়ার লেখা যেখানে ঐ পথে গেছে সেখানে তারও সার্থকতা মেলে নি, কিন্তু যেখানে লেখায় চরিত্রের ও ঘটনার উপলব্ধিও প্রধান, সেখানেই তা অতুলনীয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

মানুষ গড়ার কারিগর—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিখিবে। লেখাপড়া শিখিলে সকলে তোমাকে ভালবাসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাহাকে ভালবাসে না।

ছোটছেলে পুণ্যব্রতকে দ্বিতীয়ভাগ পড়াতে বসে ভারতী ইনস্টিটুশনের প্রৌঢ় শিক্ষক মহিমারঞ্জনের কথাগুলি বিদ্রূপের মত মনে হল। জীবনের হিসাব করে তিনি অনুধাবন করলেন, এই সমস্ত কথা তাঁর অভিজ্ঞতায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তাই তাঁর স্বগোক্তি :

[তাই বটে! আমি মহিমারঞ্জন সেন বি. এ.—লেখাপড়ায় আলস্য করিনি, ফার্স্ট হয়েছি বরাবর। চিরদিন সত্যপথ ধরে চলেছি, দৈনিক জমাখরচে একটিবার নজর দিয়েই যে-কেউ বুঝবে। দুনিয়ার ভালবাসা তাই আমার উপরে—থার্ড বি'র বেড়াল ডাকা ছেলেপুলে থেকে নিজের আত্মজা দীপালির।]

দ্বিতীয় ভাগের শিক্ষা তাঁর সিদ্ধান্তে ভুল। এই কদর্য প্রত্যয়ে স্থিত হয়েছেন মহিমারঞ্জন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে। তাঁর অতীত এবং বর্তমান দুই-ই সমান অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর বৃত্তির দীর্ঘজীবন, তাঁর নিষ্ঠা কারো শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেনি। তিনি পুণ্যব্রতকে তাই বলছেন :

'—বানান করে করে পড়, মানে শিখে নে। কিন্তু বিশ্বাস করিসনে। সমস্ত মিছে, সমস্ত ধাপ্পা—' (পৃঃ ২৫৩)

কিন্তু মহিমারঞ্জন কি নিজেও পরবর্তী কালে এই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিলেন! অথবা কতকাল তিনি দাবী করতে পারেন তাঁর নিষ্ঠার? বস্তুত শিক্ষকতার প্রথম দিকে দূরূহ অঙ্কের ক্লাশের ছাত্রদের তিনি অনায়াসে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার গুণেই। কিন্তু পরবর্তী কালে তাঁর জীবনে এমন ব্যতিক্রম ঘটল কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর মনোজবাবু দিয়েছেন। তাঁর বর্তমান উপন্যাস জনৈক শিক্ষকের দিনানুদৈনিক জীবনের বৃত্তান্ত নয়। সাধারণভাবে শিক্ষকসমাজ, শিক্ষায়তন এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে-শ্রেণী গড়ে উঠেছে তারই বিবরণ। এঁদের কথা বলতে গিয়ে তিনি মূল ঘটনার ওপর কোনো আবরণ দেবার চেষ্টা করেননি। অথবা কোনো রঙ লাগাবার। ফলে উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠকমাত্রই বিচলিত বোধ করবেন। কারণ, যে-শিক্ষাকেন্দ্র

মানুষের জীবন গড়ে তোলার প্রাথমিক সোপান, তার এই কলঙ্কজনক অবস্থা এমন সহজ করে, এমন অনাড়ম্বরভাবে এর আগে বাঙলা সাহিত্যে কেউ তুলে ধরেছেন বলে জানি না।

আমাদের দেশ আত্মত্যাগের দেশ। ঐহিক জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রচণ্ড অবিশ্বাস। কিন্তু আত্মত্যাগেরও একটি সীমা আছে।

শিক্ষায়তনের এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবার যথাযথ অধিকার মনোজবাবুর আছে। যতদূর জানি, তিনি স্বয়ং একটি বিদ্যালয়ের সঙ্গে একদা শিক্ষক হিসাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। তাঁর অভিজ্ঞতার মূল সুদূরে প্রোথিত। শিক্ষকের জীবন তিনি সমগ্রভাবে জানেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি সে-কারণেই আমাদের মনে ঘৃণার পরিবর্তে সহানুভূতির সঞ্চার করে। শুধু তাই নয়। আমাদের মনকে আলোড়িত করে। আশ্চর্য হব না, যদি "মানুষ গড়ার কারিগর" আমাদের সরকারকে এ বিষয়ে বাস্তব ও সক্রিয় অর্থে অবহিত করে।

শিক্ষকতা শ্রদ্ধার বৃত্তি। এই বৃত্তির ওপর দেশের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু প্রাত্যহিক প্রয়োজনের তাগিদে যদি সেই মহৎ বৃত্তির মানুষকে নানা নিন্দনীয় পন্থার দ্বারস্থ হতে হয়; তবে বোধকরি তাঁর সামাজিক মর্যাদাহানি হতে বাধ্য। তখন আর কেউ এই বৃত্তিকে আদর্শের নির্মাণ বলে অনায়াসে স্বীকার করে নেবেন না।

শিক্ষকতায় অনুপ্রবেশ অধিকাংশের ক্ষেত্রেই আদর্শ বোধপ্রসূত। অনেকেই মহিমারঞ্জনের মত সাতু ঘোষের অসৎ ব্যবসায়ের অংশ হতে রাজী নন। অথবা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে বড়বাবু হওয়া জীবনের চরম মোক্ষ—এ ধারণায় অপ্রত্যয়ী। কিন্তু শিক্ষকশ্রেণী মানুষের সামাজিক জীবন হতে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁদেরও কয়েকটি দায় আছে। সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন পথে যখন তাঁদের জীবনের মূল প্রয়োজনগুলির পরিপূরণ সম্ভব হয় না, তখনই তাঁদের বাঁকা, অশ্বাস্থাকর উপায় গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। অস্তিত্ব যেখানে বিপন্ন, আদর্শে আস্থাশীল থাকা কতখানি সম্ভব? ভারতী ইনস্টিটুশনের কালাচাঁদ, গগনবিহারীবাবু, সলিলবাবু এরা সকলে মহিমারঞ্জনের মত একই বৃত্তে আশ্রয়ী। বাহিরে যাবার পথ এদের কাছে রুদ্ধ। এদের জীবনের সমস্ত মূল্যবোধগুলি সে-কারণেই খণ্ডিত, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিধ্বস্ত।

মহিমারঞ্জন, সলিলবাবু তবু এক অর্থে ভাগ্যবান। মহিমারঞ্জনের মেয়ে দীপালি পালিয়ে গিয়েও সাতু ঘোষের ছেলেকেই বিবাহ করেছে। ছেলে শুভব্রত তিনটে লেটার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করল।

গল্প বলার এক সহজ, স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী মনোজবাবুর আয়ত্তে। কিন্তু সব সময় এই সারল্য সাহিত্য রচনার আবশ্যিক কারুকার্যের বিকল্প হতে পারে না। তাঁর বাচনভঙ্গী গল্পটি সহজ করে উপস্থিত করেছে, কিন্তু আঙ্গিক-সৌষ্ঠবে তাকে রমণীয় করে তুলতে পারেনি। মনোজবাবু খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তাঁর কাছ থেকেই তো আমরা আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর সাযুজ্য আশা করব।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

তারার আঁধার—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। কথাকলি। কলকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

"ঝাঁসীর রাণী", "নটী" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িত্রী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের নামের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ পরিচিত। অতীত ইতিহাসের কোনো কাহিনীর রসরূপসৃষ্টিতে লেখিকা কয়েকটি ক্ষেত্রে যে উল্লেখনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন এ কথা অনেকেরই অবিদিত নয়। "তারার আঁধার"-এর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। এখানে লেখিকা একটি বিশেষ তত্ত্বকে বর্তমানাশ্রয়ী একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে-উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের অতীতমুখী রোমাণ্টিক মন এক্ষেত্রে বর্তমানের স্বল্পমুখর বাস্তবভূমিতে বিচরণ করতে আগ্রহশীল। ইতিহাসের কোন সাহায্য না নিয়ে লেখিকা ইদানীন্তন সামাজিক পরিবেশ থেকে তাঁর উপন্যাসের মালমসলা সংগ্রহ করতে তৎপর হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে এই উপন্যাসটির একটি গুরুত্ব আছে।

পূর্বেই বলেছি—একটি বিশেষ তত্ত্বকে ব্যাখ্যা তথা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যেই "তারার আঁধার"-এর সৃষ্টি। এই তত্ত্বটির স্বরূপ সম্পর্কে লেখিকা গ্রন্থের নিবেদনে যা বলেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়।

'প্রয়োজন ও অস্তিত্ব। কথা দুটি খুব নতুন নয়। সাহিত্য ও দর্শনে বহুকাল থেকে নানাভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে—বোধহয় সেই প্লেটোর আমল থেকে। তারপর কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের ও জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথা দুটো এক গুরুতর ভূমিকা নিয়েছে—তার প্রয়োজন ও অস্তিত্ব প্রতি মুহূর্তে সরবে ঘোষণা করেছে।

"তারার আঁধার"-এর যে নায়ক, তার জীবনের বিরাট ট্রাজেডির মধ্যে আছে একটা আঙ্কিক গোলযোগ। এই প্রয়োজন ও অস্তিত্বের বে-হিসেব। এই হিসেব অনেকটা অর্থনীতির ডিম্যান্ড ও সাপ্লাইয়ের মতো। মেপে-মেপে ভেবে-ভেবে চলতে হয়। নইলে জীবনের জটিলতার হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। আসল কথা, এ-সব চরিত্র আমার দেখা। আমি দেখেছি এই বাংলাদেশে "তারার আঁধার"-এর নায়করা জন্মায় যত, মরেও তত। দেখেছি আর ভেবেছি। তারপর একদিন আমার সেই দেখা ও ভাবাকে মিলিত করে একটা গল্পে রূপ দেবার চেষ্টা করি।'

লেখিকা এখানে যে তত্ত্বের কথা বলেছেন তা চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে সেই চিরন্তন গরমিলের ব্যাপার। চাওয়া অনুযায়ী পাওয়া ঘটে না বলেই জীবনে সংঘাতের সৃষ্টি হয় ও পরিশামে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বস্তুত চাওয়া-পাওয়ার বিষয়ে হিসেবনিকেশের ভুলের মূলে যে মানবিক অক্ষমতা বা দুর্বলতা তাই ট্রাজেডির মূল উৎস। যাইহোক লেখিকার উপস্থাপিত তত্ত্বটি সাধারণভাবে অগ্রহণীয় নয়। কিন্তু উপন্যাস-প্রণয়নের দিক দিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব আমদানী করাই খুব বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে ঐ তত্ত্বটিকে আশ্রয় করে জীবনের রসরূপরচনার সফলতা। উপন্যাসের মধ্যে তত্ত্ব প্রচার বা প্রতিষ্ঠার অতি সচেতন প্রচেষ্টা এর শিল্পসম্মত সৌন্দর্যসুষমাকে ক্ষুণ্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মত জিনিসটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মতো। ওটা ভিতরে থেকেই সাহিত্যকে যোগ্যরূপে মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি, বাইরে থেকে প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহ-সৌষ্ঠব, তার লাবণ্য।' প্রকৃতপক্ষে কোনো মতবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে সাহিত্যিকের পক্ষে সার্থক উপন্যাস সৃষ্টি করা অসম্ভব। আলোচ্য উপন্যাসের নায়ক বিজয় দাশের মধ্য দিয়ে লেখিকার

তত্ত্বপ্রচারের সন্ধান প্রয়াস জীবনের বাস্তবপ্রতিম রসসৃষ্টিনির্মাণে কতক পরিমাণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বিজয় যে পরিমাণে একটা তত্ত্বের প্রতিমূর্তি সেই পরিমাণে রক্তমাংসের মানুষ নয়। তাকে একটা তত্ত্বের বাহক করতে গিয়ে লেখিকা তার মানবিক বৃত্তিগুলিকে অস্বাভাবিকভাবে সংকুচিত করেছেন বলে মনে হয়। বস্তুত বিজয়ের ট্রাজেডি এখানে বিশেষ কোন রসরূপ লাভ করে নি।

কাহিনীবিন্যাসে লেখিকা ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের সব রকম প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, তখন সে উন্মাদ হয়ে গেল এবং তার ভাই কুমুদ তাকে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের এক এ্যাসাইলামের উদ্দেশ্যে ফোরটিন আপ ট্রেনে যাত্রা করলো। মধ্যপ্রদেশের একটি শিল্পকেন্দ্রের উপান্ত অঞ্চলের একটি স্টেশানের কাছে বম্বে মেলকে পাস করে যাবার সময় ট্রেনটি গতি শ্লথ করতেই বিজয় জানলা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে তার উন্মাদজীবনের অবসান ঘটালো। এই অঞ্চলে বিজয়ের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বাদল এসেছিল সরকারী কাজে বদলী হয়ে। কুমুদ স্টেশানমাস্টারের কাছে বাদলের খবর পেয়ে তাকে ডেকে নিয়ে গেল স্টেশানে। কুমুদ বাদলকে বিজয়ের আত্মহত্যার সংবাদ দিতে যেখানে তার বাসায় এসেছে, সেখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসের শুরু। এর পর বাদলের জবানিতে বিজয়ের জীবনের পূর্বঘটনা বিবৃত করা হয়েছে। এই ফ্ল্যাশ ব্যাক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে অপরিহার্য ঔৎসুক্য অনেক কমে গিয়েছে। তা ছাড়া এই গ্রন্থের মধ্যে সত্যকার উপন্যাসের স্বাভাবিক বিস্তার ও গভীরতা অনেকাংশে অনুপস্থিত। লেখিকা গ্রন্থের নিবেদনে জানিয়েছেন যে এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু প্রথমে 'ছায়াবাজি' নামে একটি একটি গল্পে পরিবেষিত হয়েছিল। তারপর লেখিকার কথায় 'কিন্তু তখন থেকেই আমার মনে হয়েছে যে, বিষয়টি এত ব্যাপক, প্রশ্নটি এত গভীর যে, তাকে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে বন্দী রাখলে অন্যায় হবে।' বিষয়টি ব্যাপক ও গভীর হলেও একে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি যে উপন্যাস রচনা করেছেন তা যেন ছোট গল্পেরই এক অনাবশ্যক দীর্ঘ সংস্করণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিকে ছোট গল্পের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে খুব অসংগত হত না বলে বোধ হয়। ঘটনাবিন্যাসের দিক দিয়েও কয়েকটি অসংগতি চোখে পড়ে। (পৃ ২, ৪, ১৪০)

চরিত্রচিত্রণের ব্যাপারে নায়ক বিজয় দাশের চরিত্রে সংগতি ও বাস্তবতার অনটন অনুভূত না হয়ে পারে না। বাংলা দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে বিজয়ের মনে তার আত্মীয়-স্বজন ও ভক্তবন্ধুজনের স্তুতিবাদে নানা উচ্চাশা ও স্বপ্নকামনা নীড় বাঁধলো। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার তেমন কোন পূরণ না হওয়া সত্ত্বেও কেন যে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল তার কারণ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ছাত্র, লেখক, সাংবাদিক, চিত্রকর, সংগীতগবেষক কোন হিসেবেই বিজয় কোন কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারে নি। প্রতি ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা দেখেও কেন যে নিজের প্রতিভা সম্পর্কে তার ধারণা আহত হয় না তা নির্ণয় করা কঠিন। লেখিকার বর্ণনা থেকে মনে হয়, বিজয় নিজেকে ছাড়া অপর কাউকে ভালবাসতে পারে না। নিজের প্রতিভাতে সে নিজেই মুগ্ধ। শুধু নিজের প্রেমেই সে নিবিষ্ট। তাই যদি হয় তবে প্রথম থেকেই বিজয়ের মানসিক সুস্থতার বিষয়ে সন্দেহ জাগে এবং বাংলাদেশে বহু সংখ্যায় বিজয় দাশের মত চরিত্রের বিদ্যমানতা সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ না থেকে পারে না। বিজয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী রূপকে খুব বেশী বড় করে দেখাতে গিয়ে তার মানবিক রূপকে খর্ব করে ফেলা হয়েছে। ফলে বিজয়ের ট্রাজেডি বাঞ্ছিতভাবে মনে রসনিষ্পত্তি করে না। পাগল

হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিজয়ের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের অপ্রতুলতা বিশেষভাবে অনুভূত হয়।

কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র অঙ্কনে লেখিকার কৃতিত্বের পরিচয় পরিস্ফুট। বিজয়ের বাবা গোপালবাবুর চরিত্রটি স্বাভাবিকতার গুণে হৃদয়গ্রাহী। বিজয়ের বন্ধু অরুণ এবং তার প্রণয়প্রার্থিনীও এ উপন্যাসের প্রধান স্ত্রীচরিত্র মাধবীর মধ্যে রোমান্টিক ভাবালুতার আতিশয্য থাকলেও বাস্তবিকতার স্পর্শ বর্তমান এবং সেই হিসেবে কতক পরিমাণে সার্থক। তবে লেখিকা সবচেয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন রেইনী পার্কের 'সিলেক্টভসার সোসালাইটদের ফানুসের মত অন্তঃসারশূন্য জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ আলেখ্যচিত্রণে। এদের মধ্যে বিশেষ করে বুলা রায় ও পিকপিক সোমের চরিত্র দুটিতে একটু চড়া রঙের স্পর্শ থাকলেও সজীবতার গুণে মনকে আকর্ষণ করে।

লেখিকার ভাষা মোটামুটি উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ ও ঝরঝরে। কোনো কোনো জায়গায় বর্ণনানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সুশীলকুমার গুপ্ত